ঈদ সংখ্যা

জুন ২০১৯ ▪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

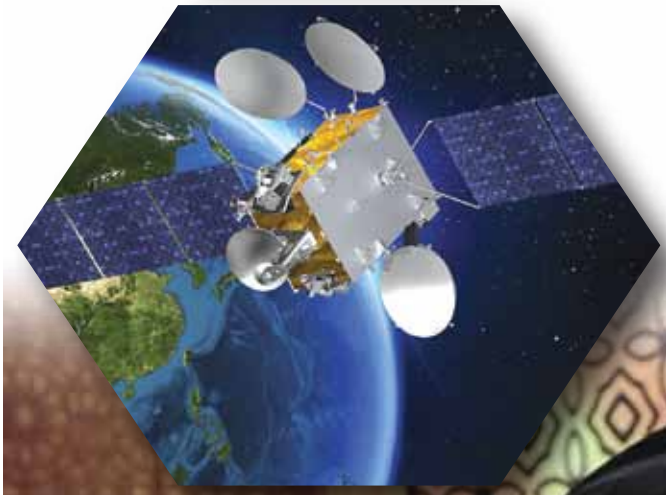

বাঙালির মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ঐতিহাসিক সাতই জুন

ঈদ হোক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উৎসব

বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতি ও বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: আমাদের গর্ব

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

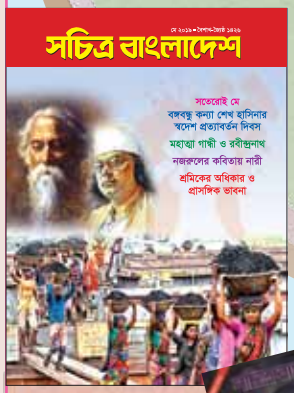

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

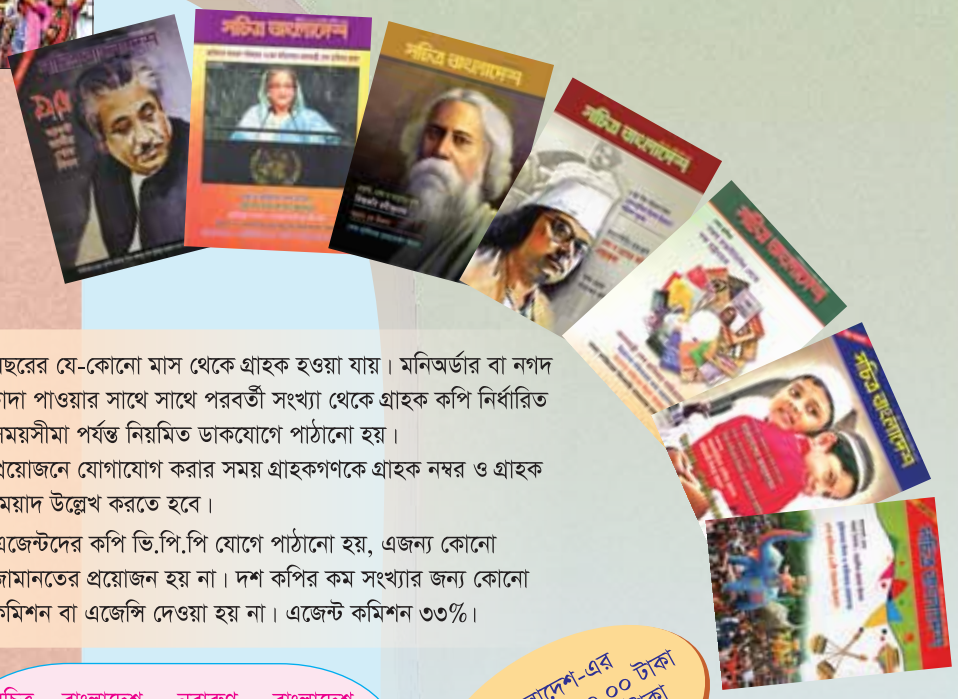

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 12, June 2019, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

জুন ২০১৯ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হোটেল সিপ্রিয়ানি লি স্পেসিয়ালিতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner-এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানের মতো মাহে রমজান শেষে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ যে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে, তার মর্মমূলে আছে শান্তি ও ভালোবাসা। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর ঈদ সংখ্যায় রয়েছে– ঈদের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা। সবাইকে জানাই ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ঘটে এক ঐতিহাসিক বিপ্লবী ঘটনা। এ দিনে ছয় দফার আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ করার জন্যই প্রতিবছরের ৭ই জুন ছয় দফা দিবস পালিত হয়। ছয় দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ নিয়ে এবারের সংখ্যায় রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। 'পরিবেশ সুরক্ষা' কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ-এর অন্যতম। বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বের সাথে কাজ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার অর্জন করেন। এ দিবস উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ এবং বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সরকারের সাফল্যের প্রতিবেদন এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১২ই মে ২০১৮ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে মহাকাশ অভিযাত্রায় ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে বাংলাদেশ। উৎক্ষেপণের এক বছর পর ১৯শে মে ২০১৯ বাণিজ্যিক সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১)'। এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যায়।

গ্রীষ্মে পাওয়া যায় নানারকম সুস্বাদু ফল। গ্রীষ্মকাল ও তার ফল নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ। ১৮ই জুন বিশ্ব বাবা দিবস। বাবা দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা। আরো অন্যান্য কয়েকটি দিবস উপলক্ষে রয়েছে নিবন্ধসমূহ। এছাড়া রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, গল্প ও নিয়মিত প্রতিবেদন।

আশা করি, ঈদ সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সম্পাদক
মোঃ শরিফুল ইসলাম

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৪৯৩৫৭৯৩৬
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
বাঙালির মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ঐতিহাসিক সাতই জুন ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন
ঈদ হোক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উৎসব ৬
মিজানুর রহমান মিথুন
বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতি ও বাংলাদেশ ৭
মোস্তফা কামাল পাশা
অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় জাকাতের ভূমিকা ও করণীয় ৯
খান চমন-ই-এলাহি
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: আমাদের গর্ব ১২
মোহা. আব্দুল মানিক
বাবা দিবস ও দিবসবিহীন বাবারা ১৪
নাসরীন মুস্তাফা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনে সরকারের সাফল্য ১৫
ভোক্তা অধিকার আইন এবং নিরাপদ মানসম্পন্ন পণ্য ১৭
ম. জাভেদ ইকবাল
গুচ্ছগ্রাম: আশ্রয়হীনদের আশ্রয় ১৯
রেজুয়ান খান
বাংলাদেশের হরিণ ২০
অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান
উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ডাল উৎপাদন ২৪
ড. এম. জি. নিয়োগী
১৪ই জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ২৫
সানজিদা আহমেদ
দস্যুমুক্ত সুন্দরবন রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ২৬
বিনয় দত্ত
বজ্রপাত: গবেষণা ও সচেতনতা প্রয়োজন ২৮
ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ
কবি সুফিয়া কামালের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী ২৯
হোসেন জাহিদ
প্রকৃতি ও নারী প্রেমে মগ্ন মনীষী কবি জীবনানন্দ দাশ ৩০
শাফিকুর রাহী
বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও তার ফল ৩৩
মিতা খান
বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু ৩৭
কে সি বি তপু

হাইলাইটস

১২ই জুন: বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ৩৮
সৈকত নন্দী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ৩৯
জেসিকা হোসেন

গল্প

সবার জন্য ঈদ ৪৩
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

কবিতাগুচ্ছ ১৮, ৪১, ৪২, ৪৩
ফারুক নওয়াজ, জাকির হোসেন চৌধুরী, লিলি হক সাদিয়া সিমরান, বাবুল তালুকদার, শিল্পী মণ্ডল শাহনাজ, শফিকুর রহমান চৌধুরী, বাতেন বাহার তাহমিনা বেগম, গোলাম নবী পান্না, আউয়াল রণী রুস্তম আলী, আমিনুল ইসলাম কাইয়ূম, ওয়াসীম হক মিতা, নিহাল হোসেন খান, মোহাম্মদ হোসেন রবিউল ইসলাম, রবিউল ইসলাম রবি, মো. সবুজ খান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিক্ষা ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
বিনিয়োগ ৫৩
নারী ৫৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৪
কৃষি ৫৫
কর্মসংস্থান ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
যোগাযোগ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
মাদক প্রতিরোধ ৫৯
প্রতিবন্ধী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
সংস্কৃতি ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬২
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে সুবীর নন্দী ৬৪

বাঙালির মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ঐতিহাসিক সাতই জুন

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় নেতাদের সম্মেলনে ঘোষণা করেন ছয় দফা, যা বাঙালির প্রথম মুক্তিসনদ। পরবর্তীকালে এই ছয় দফার কারণে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ আরো অনেক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই ছয় দফাকে সামনে রেখে ছাত্রদের ১১ দফা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি অংশ নিয়েছিল। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল ইশতেহার ছিল এই ঐতিহাসিক ছয় দফা। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ ছয় দফার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি। এ বিষয়ে জানতে 'বাঙালির মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ঐতিহাসিক সাতই জুন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

ঈদ হোক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উৎসব

খুশির বার্তা নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে আসে ঈদ। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা শেষে শাওয়ালের নতুন চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদ। সবাই উঁচুনীচু, ছোটো-বড়ো জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈদ আনন্দে মেতে ওঠে। এই সম্প্রীতির বন্ধন সত্যি অনন্য। এদিন সবাই সব কিছু ভুলে গিয়ে খুশির ভুবনে হারিয়ে যাই। পবিত্র ঈদ বিষয়ে 'ঈদ হোক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৬

বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতি ও বাংলাদেশ

পরিবেশ সংরক্ষণ এখন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর বিপর্যয় রোধে সারা বিশ্ব এখন সোচ্চার। পৃথিবীকে সুন্দর ও বাসযোগ্য রাখতে বিশ্বের কিছু মানুষ উদ্যোগ নিচ্ছেন, যার মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় নিজস্ব অর্থায়নে গঠন করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। গত ১০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ ফান্ডের অর্থায়নে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ সারা দেশে গ্রহণ করা হয়েছে ৪৬৮টি প্রকল্প। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অর্জন করেছেন জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার। বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে এবং বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ বিষয়ে দেখুন 'বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতি ও বাংলাদেশ শীর্ষক' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৭

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: আমাদের গর্ব

সবচেয়ে আনন্দ ও গর্বের বিষয় হলো- বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ। এর মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত স্যাটেলাইট ক্ষমতাধর দেশের তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণের পরপরই সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, মহাকাশে আজ উড়ল বাংলাদেশের পতাকা। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট : আমাদের গর্ব' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

প্রবন্ধ

বাঙালির মুক্তিসনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা এবং ঐতিহাসিক সাতই জুন

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা বাঙালির প্রথম মুক্তিসনদ। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে এই সনদ প্রণয়ন করেন এবং প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় নেতাদের সম্মেলনে ঘোষণা করেন। পরে নিজের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা ছেপে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) প্রচার করেন এবং ছয় দফা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সমগ্র বাংলাদেশে সফর করেন এবং জনমত সৃষ্টি করেন।

ছয় দফার দাবি-দাওয়া তখন ঐ সম্মেলন এবং পাকিস্তানি শাসকবর্গ মেনে নেওয়া তো দূরের কথা– বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর হাজার হাজার কর্মীকে জেলে ঢোকায় এবং ছয় দফার দাবিতে দেশব্যাপী ৭ই জুনের হরতালে গুলি চালিয়ে ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেককে হত্যা করে।

১৯৪৭ সালে আমাদের বাপ-দাদারা একবার ভুয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। মূলত বাঙালিরা তখন পাঞ্জাবিদের অধীনেই স্বাধীনতা পেয়েছিল। ভাষার প্রশ্নে সেই '৪৭ এর শুরুতে এবং '৪৮ ও '৫২ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। '৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং বাঙালিদের ওপর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য নেমে আসে। ফলে সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতনের ঘায়ে বাঙালি জর্জরিত হয়। আর তখনই শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মতান্ত্রিক উপায়ের কথা চিন্তা করে ছয় দফা দাবি প্রণয়ন করেন। মূলত পাকিস্তানের অধীনে এটি ছিল ফেডারেল ব্যবস্থার নতুন কাঠামো। অথচ এটিকে বিরোধী দলীয় নেতারা গ্রাহ্য করেনি। সম্মেলনের বাইরে এসে তিনি প্রথম সাংবাদিকদের কাছে তাঁর মত প্রকাশ করেন। ঢাকায় ফিরে ছয় দফার পুস্তিকা ছাপেন। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ও শেখ মুজিবের মানিক ভাই (তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া)। পরবর্তীকালে এই ছয় দফার কারণে বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ আরো অনেক মামলায় আটকানো হয়েছে। এই ছয় দফাকে সামনে রেখে ছাত্রদের ১১ দফা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি অংশ নিয়েছে। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের মূল ইশতেহার ছিল এই ঐতিহাসিক ছয় দফা। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বিজিতদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল সেই '৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাতে। তারপর স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ, পুরোপুরি ছয় দফাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। ১৯৬৬ থেকে ২০১৯-এ ৫৩ বছর গত হয়েছে। এখন মনে হয়, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাই বাঙালিকে একটি বিপ্লবের জন্য সংগঠিত করেছিল। ফলশ্রুতিতে আমরা ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু ছয় দফায় কী ছিল? তাও আমাদের জানা প্রয়োজন। দফাগুলো ছিল এরকম:

১. লাহোরে প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন

করতে হবে। এটি সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময় যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

অথবা,

দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা ও মূলধন পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

১৯৬৬ সালের ৭ই জুন এই ছয় দফার কারণেই আমাদের কাছে বেশি স্মরণীয়। ঐ বছরের ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হয় এবং ছয় দফা কর্মসূচিকে সামনে রেখে মিছিল-মিটিং চলে। এদিকে আইয়ুব খান ঢাকায় এসে ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তান ভাঙার দফা বলে হুমকি দেন এবং এক পর্যায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন সমগ্র দেশে হরতাল ডাকা হয়। হরতালের সময়ে ঢাকার তেজগাঁও শ্রমিক অঞ্চল ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিক অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন শ্রমিক। শত শত আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় আর এর প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দল ওয়াক-আউট করেন। ছয় দফা আন্দোলন তুঙ্গে দেখে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইবুনালে বিচার শুরু করে। ছয় দফা কর্মসূচি আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। '৭০-এর নির্বাচনই ছয় দফার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি। তারপরও বাঙালির স্বরাজের জন্য প্রাণ দিতে হয়, মা-বোনের সম্ভ্রম হারাতে হয়। সে তো রক্ত-আখরে লেখা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জনের কাহিনি, স্বাধীন বাংলাদেশের যুদ্ধ জয়ের কাহিনি। আমাদের সংবিধান ছয় দফার আলোকে রচিত।

ছয় দফা আঞ্চলিক সত্তার নিরিখে প্রণীত হলেও বাঙালির এটি ছিল প্রথম জাগরণের কর্মসূচি। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এগুলো মানলে আমাদের আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটত। পাকিস্তানিদের কোনো ক্ষতি হতো না। পাকিস্তান ভাঙার ভয়ডরই কর্তৃপক্ষকে পরবর্তীকালে বাঙালি নিধনে ইন্ধন জুগিয়েছে। আমাদের ঝরেছে এক সাগর রক্ত। ছয় দফার সেই রক্তের সোপান তৈরি করেছিল

আমাদের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা। ছয় দফা তাই বাঙালির মুক্তিসনদ, যার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে অডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে অডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছে। ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সর্ববৃহৎ ডিজিটাল এ সংগ্রহশালা মুক্তিযুদ্ধ পাঠশালা নামে অডিও ডকুমেন্টারির প্রথম অংশ প্রকাশ করেছে। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির বড়ো আন্দোলনগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, এগারো দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলনসহ ছয়টি পর্বে এই অডিও ডকুমেন্টারিকে সাজানো হয়েছে। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা সাব্বির হোসাইন বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকেরই ধারণা স্পষ্ট নয়। এর কারণ প্রামাণ্য ইতিহাস প্রচারের অভাব এবং স্বাধীন বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপরীত আদর্শের ধারকদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা। ডকুমেন্টারিগুলো এ বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শান্তা আনোয়ার জানান, ডকুমেন্টারিগুলোতে তথ্যের বিশুদ্ধতা, ঘটনার বিস্মৃতি ও শ্রুতিমধুরতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: রফিকুল ইসলাম

ঈদ হোক সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ উৎসব

মিজানুর রহমান মিথুন

খুশির বার্তা নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে আসে ঈদ। ঈদুল ফিতর। আমরা এই দিনটির জন্য সবাই সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এই দিনটি দেশের মুসলমানদের প্রধানতম ধর্মীয় উৎসব হলেও সব ধর্মের মানুষই ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। সবাই উঁচুনীচু, ছোটো-বড়ো জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈদ আনন্দে মেতে ওঠে। এই সম্প্রীতির বন্ধন সত্যি অনন্য। এই দিন সবাই সব কিছু ভুলে গিয়ে খুশির ভুবনে হারিয়ে যায়।

ঈদুল ফিতর নিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কী সুন্দর উচ্চারণ– 'আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে, তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামের মুরিদ'।

ঈদের জামাত

সত্যিই হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সাম্য-সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠার বার্তা নিয়ে বছর ঘুরে আবার এসেছে পবিত্র ঈদ। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা শেষে শাওয়ালের নতুন চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদ। রোজাদার যে পরিচ্ছন্নতার ও পবিত্রতার সৌকর্য দ্বারা অভিষিক্ত হন, যে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, উদারতা, বদান্যতা, মহানুভবতা ও মানবতার গুণাবলি দ্বারা উদ্ভাসিত হন, এর গতিধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে ঈদুল ফিতর সমাগত হয়। এদিন যে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হয়, তা অফুরন্ত পুণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ।

ঈদের নতুন চাঁদ দেখামাত্র রেডিও-টেলিভিশন ও পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় খুশির বার্তা– 'ঈদ মোবারক'। সেই সঙ্গে চারদিকে শোনা যায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত রোজার ঈদের গান: 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাগিদ'।

সারা বিশ্বের মুসলমানের সর্বজনীন আনন্দ-উৎসব ঈদুল ফিতর। বছরজুড়ে নানা প্রতিকূলতা, দুঃখ-বেদনা সব ভুলে ঈদের দিন মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। ঈদ এমন এক নির্মল আনন্দের আয়োজন, যেখানে মানুষ আত্মশুদ্ধির আনন্দে পরস্পরের মেলবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ হন এবং আনন্দ সমভাগাভাগি করেন।

মাহে রমজানের এক মাসের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেদের অতীত জীবনের সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হতে পারার পবিত্র অনুভূতি ধারণ করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈদের খুশি। আর আনন্দ ও পুণ্যের অনুভূতিই জগতে এমন এক দুর্লভ জিনিস, যা ভাগাভাগি করলে ক্রমেই তা বৃদ্ধি পায়।

রমজান মাসে সংযম ও আত্মশুদ্ধি অনুশীলনের পর ঈদুল ফিতর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষকে আরো ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করে, গড়ে ওঠে সবার মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বন্ধন। ঈদের দিন মসজিদে, ময়দানে ঈদের নামাজে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লির সমাগম হয়ে থাকে। সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে ঈদের নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে ধনী-নির্ধন, পরিচিত-অপরিচিত সবাই সানন্দে কোলাকুলি করেন।

রাজধানীতে জাতীয় ঈদগাহ ময়দান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ দেশের সব ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাতে পার্থিব সুখ-শান্তি, স্বস্তি আর পারলৌকিক মুক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সেই সঙ্গে বিশ্বশান্তি এবং দেশ-জাতি ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরোত্তর শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও সংহতি কামনা করা হয়।

ঈদুল ফিতর আনন্দ উদ্‌যাপনই একমাত্র উপলক্ষ নয়। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। কারণ ঈদুল ফিতরের সময় গরিব ও অভাবী মানুষের মাঝে জাকাত দেওয়া হয়। জাকাত কেবল একটি ফরজ বিধানই নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাকাতের গুরুত্ব অনেক। আজকের মুসলিম বিশ্বে, বিশেষত বাংলাদেশে অর্থের অভাব নেই কিন্তু অনেক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নেই। জাকাত গরিব মানুষের অভাব দূর করতে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুতরাং ঈদের সময় সম্পদের সঠিক হিসাব করে জাকাত আদায় করলে দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতই একমাত্র বিকল্প হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে ঈদ ধনী-দরিদ্র, সুখী-অসুখী, আবালবৃদ্ধবনিতা সব মানুষের জন্য কোনো না কোনোভাবে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দের আয়োজন। ঈদ ধর্মীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় এবং পরস্পরের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের শিক্ষা দেয়।

মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা হলো জগতের সব মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। পৃথিবী সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানিমুক্ত হোক! সন্ত্রাসের বিভীষিকা দূর হোক! আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হোক! আগামী দিনগুলো সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হোক! হাসি-খুশি ও ঈদের আনন্দে ভরে উঠুক প্রতিটি প্রাণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংযম, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক– এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা।

ঈদের আনন্দ থেকে আমরা সবাই শিক্ষা নেব– মিলেমিশে বসবাস করতে, সবাইকে ভালোবাসতে। সেই সঙ্গে সারাবছর সব ধর্মের মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে শান্তি-সম্প্রীতিময় বাংলাদেশ গড়ব-এটাও প্রত্যাশা করছি। ঈদ হোক আনন্দময়। ঈদ মোবারক।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ২৪.কম

বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতি ও বাংলাদেশ

মোস্তফা কামাল পাশা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তবে ক্ষতির মাত্রা বা পরিমাণ কিংবা সময়কাল– এর কিছুই আমরা এখনো জানি না। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ফোকাল মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় UNFCCC, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), IPCC-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম ও সংস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি এবং নীতিগত অবস্থান যথাযথভাবে তুলে ধরছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে, হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন, বাড়ছে আশঙ্কা ও ভয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার এবং শিল্পবর্জ্য উদগীরণ মূলত এ দুটো কারণেই বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু এর সাথে আরো একটি বিষয় যোগ করেন সমাজবিজ্ঞানীরা, সেটি হচ্ছে মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ। মানুষ তার অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের ফলে কারণে-অকারণে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নষ্ট করে চলেছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। গ্রিন হাউস গ্যাসের ব্যাপক নির্গমনের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে ক্রমাগতভাবে সৃষ্টি করছে ভয়াবহ পরিস্থিতি। উন্নত দেশগুলোর ভোগবাদী আচরণ অনুন্নত কিংবা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ঠেলে দিচ্ছে ভোগান্তির মুখে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই নভেম্বর ২০১৬ মরক্কোর মারাকাসের বাব ইগলিতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের (কপ-২২) উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমানোর জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গঠিত Intergovernmental Negotiating Committee (INC) ১৯৯২ সালের ৯ই মে United Nations Framework Convention on Climate Change–UNFCCC বা জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন গঠন করে। কনভেনশনটিতে রাষ্ট্রসমূহের স্বাক্ষরের জন্য ১৯৯২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় Earth Summit বা ধরিত্রী সম্মেলন। জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় চলমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় নেগোসিয়েশন একটি বহুমাত্রিক, বৈচিত্র্যপূর্ণ, জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এখানে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ১৯৫টি সদস্য দেশের সর্বসম্মত ঐক্যমতের প্রয়োজন হয়।

UNFCCC'র সাথে যুক্ত ৩৯টি উন্নত দেশকে এ্যানেক্স-১ দেশ (Developed Countries or Annex ও Parties) এবং অবশিষ্ট দেশসমূহকে উন্নয়নশীল দেশ বা নন এ্যানেক্স-১ দেশ (Developing Countries or Non-annex ও Parties) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কনভেনশনে মূলত উন্নত দেশসমূহকে গ্রিন হাউস গ্যাস বা কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করতে বলা হয়েছে।

আশির দশকের শেষার্ধে বিশ্বের দেশসমূহের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সামর্থ্য, শিল্পায়নের উৎকর্ষতা, কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ তথা উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিবেচনা করে তৎকালীন Organization for Economic Cooperation (OECD)-এর দেশসমূহকে এ্যানেক্স-১ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে সময় বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগের উৎস ছিল এ দেশসমূহ। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবেই বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগের জন্য দায়ী ছিল।

UNFCCC-তে শিল্পোন্নত দেশসমূহের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের যে অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে তাকে আরো সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ করতে এবং আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতায় আনার জন্য ১৯৯৭ সালে সর্বসম্মতভাবে কিয়োটা প্রটোকল গৃহীত হয়। তবে বর্তমানে কিয়োটো প্রটোকলের কার্যকারিতা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ কিয়োটো প্রটোকলের সাথে সংযুক্ত এ্যানেক্স-বি তালিকায় প্রতিটি শিল্পোন্নোত দেশের জন্য ভিত্তি বছর ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০৮ থেকে ২০১২-এর মধ্যে কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ কমাবে তার শতকরা হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও পৃথিবীর শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে এ প্রটোকলে স্বাক্ষর করলেও পরে কংগ্রেস অনুসমর্থন না করায় দেশটি এই প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা থেকে সরে যায়। প্রটোকলের প্রথম পর্যায়ের শেষ বর্ষে ২০১২ সালে কানাডাও প্রটোকল থেকে বের হয়ে যায়। অন্যদিকে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০১৩-২০২০) জন্য গৃহীত সংশোধনীতে জাপান, রাশিয়া ও নিউজিল্যান্ড অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ফলে কিয়োটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায়ের

মাধ্যমে বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অবশিষ্ট শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ কোনো ধরনের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। কনভেনশনের শর্ত অনুযায়ী ১৪৪টি দেশ কিয়োটো প্রটোকলের সংশোধন অনুসমর্থন না করায় অদ্যাবধি প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্যায় কার্যকর হতে পারেনি।

UNFCCC গৃহীত হওয়ার পর গত প্রায় ২৫ বছরে বিশ্বের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের অগ্রগতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুতগতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে বর্তমানে পৃথিবীর শীর্ষ কার্বণ নিঃসরণকারী দেশ চীন এবং তৃতীয় শীর্ষ কার্বণ নিঃসরণকারী দেশ ভারত। বিশ্বের প্রথম ২০টি সর্বোচ্চ কার্বণ নিঃসরণকারী দেশের মধ্যে ১০টিই উন্নয়নশীল দেশ। এ অবস্থায় এ্যানেক্স-১ ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ বর্তমানে পৃথিবীর মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের জন্য দায়ী, বাকি শতকরা প্রায় ৬০ ভাগের উৎস হলো উন্নয়নশীল দেশ। অন্যদিকে বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মাত্র দুটি দেশ– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন থেকে উদ্ভূত।

এ অবস্থায় ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ১৭তম জলবায়ু সম্মেলনে ২০১৫ সালে ২১তম প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, কার্যকর, দীর্ঘমেয়াদি, সকলের অংশগ্রহণমূলক ও আইনি বাধ্যবাধকতাযুক্ত সার্বজনীন চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমুহের জন্য এই প্যারিস চুক্তিটি অত্যন্ত জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্মেলনে কনভেনশনের সকল সদস্য দেশের (১৯৫টি দেশ) ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে UNFCCC-এর আওতায় একটি জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি গৃহীত হয়, যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement) নামে অভিহিত। চুক্তিটি ২২শে এপ্রিল ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে স্বাক্ষরের জন্য রাখা হয়। ২২শে এপ্রিল ২০১৬ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জলবায়ু কূটনীতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে UNFCCC গঠন ও গ্রহণের সময়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি গ্রহণের সময়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট নিশ্চয়ই এক নয়, বা এক ছিল না। এই দুটি সময়কালের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিশ্লেষণ একটু দেখা যেতে পারে। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের মূল লক্ষ্য ও নীতিমালার আলোকে প্যারিস চুক্তিটি কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, ভারসাম্যমূলক ও বাস্তবভিত্তিক হয়েছে সে দিকটিও দেখা প্রয়োজন।

সম্মেলন শুরুর দিকে উন্নত দেশসমূহ ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লব পূর্ব সময়ের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করলেও বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তীব্র দাবির মুখে প্যারিস চুক্তিতে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ নিচে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এমনকি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণের কথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির কারণে কী ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে সে বিষয়ে ২০১৮ সালে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রণয়ণের জন্য ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC)-কে অনুরোধ করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার্বিকভাবে পর্যালোচনা ও নিরূপণের লক্ষ্যে পাঁচ বছর পরপর লক্ষ্যমাত্রা পুনর্বিবেচনা (Global stocktake) করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার প্রথমটি হবে ২০২৩ সালে।

প্যারিস চুক্তির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা হলো– বিশ্বের শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশসমূহকে এই চুক্তির বাধ্যবাধকতায় আনার জন্য কিছু কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। যেমন– মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, আর্থিকসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা স্ব স্ব দেশ নির্ধারণ করবে, যা পাঁচ বছর পর পর Nationally Determined Contribution-এর মাধ্যমে কনভেনশন সচিবালয়ে দাখিল করা হবে এবং তার ওপরই বিশ্ব সম্প্রদায়ের নির্ভর করতে হবে। এই কারণে এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত Compliance Mechanism শক্তিশালী করা যায়নি। এছাড়া উন্নত দেশের প্রবল আপত্তির মুখে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' সংক্রান্ত liability and compensation আরোপের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

UNFCCC'র আওতায় পরিচালিত গত দুই দশকের নেগোসিয়েশনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সত্যিকার অর্থে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, কার্যকর, দীর্ঘমেয়াদি, সকলের অংশগ্রহণ ও আইনি বাধ্যবাধকতাযুক্ত সার্বজনীন চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্যারিস চুক্তি একটি ঐতিহাসিক শুভ সূচনা। তবে একটি অনিশ্চয়তা এখনো থেকেই যাচ্ছে, সেটা হলো সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। প্যারিস চুক্তিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর 'অর্থনৈতিক বোঝা' চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন।

এরকম একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও আমাদের দেশ, আমাদের সরকার কিন্তু বসে থাকেনি। আমাদের দেশের গণমানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু প্রথম থেকেই ব্যক্তিগতভাবেই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের চেয়েও দায়িত্বশীল আচরণ করেছেন এই ধরিত্রী এবং বাংলাদেশের জন্য। তাঁরই নির্দেশনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি সমন্বিতভাবে মোকাবিলার জন্য Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন করে। BCCSAP-এর আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ৬ শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকারের এ ধরনের যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীকে 'চ্যাম্পিয়নস্ অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জরুরি কিছু নীতিমালা ও রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে; বাংলাদেশের ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান, ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন, বাংলাদেশ কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান এবং থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশনের মধ্যে অন্যতম। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে নিজেদের আন্তরিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় জাকাতের ভূমিকা ও করণীয়

খান চমন-ই-এলাহি

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের কল্যাণের সব কথা বলা হয়েছে। নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, শারীরিকভাবে সুস্থ-অসুস্থ, ক্ষমতার ভেতর-বাইরের কোনো কথা ইসলাম বাদ দেয়নি। এমন কোনো প্রয়োজনের কথা নেই যা ইসলাম বলেনি। জাকাত নিশ্চয়ই সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য, যার অভাব কিংবা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্য জাকাত আবশ্যকীয়। সমাজ-রাষ্ট্রের নাগরিকদের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার জন্য জাকাত সহায়ক শক্তি, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলামি অর্থনীতির মূল কাঠামো, বুনিয়াদ হলো জাকাত।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত সাক্ষ্য প্রদান বা ঈমান আনা, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল; দ্বিতীয়ত নামাজ কায়েম করা; তৃতীয়ত রোজা রাখা; চতুর্থত জাকাত প্রদান করা এবং পঞ্চমত হজ আদায় করা। সুস্পষ্টভাবে জাকাতের কথা এসেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরানে ইরশাদ করেন, তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু কর (সূরা বাকারা: ৪৩)। সমাজের মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং আগামীর কথা মানুষ খুব বেশি জানতে পারে না। কোনো বিষয়ের অনুমান বা গবেষণা শত শত বছরের জন্য করা সম্ভব নয়। তাই আমরা হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার কথা শুনি, সমাজের শ্রেণি বিভাজনের কথা শুনি এবং সমাজ নির্মাণ করতে চাই এমনভাবে সেখানে কেবলি সুখ-শান্তি আর ন্যায়বিচার থাকবে। আমরা ব্যর্থ হই। মহান আল্লাহ্ আমাদের এ অবস্থার কথা জানেন। তাই পবিত্র কোরানুল করিমে ইরশাদ করেন এবং তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক (সূরা যারিয়াত:১৯)। জাকাত-সদকার গুরুত্ব বোঝাতে পবিত্র কোরানে মহান আল্লাহ আরো বলেন, উহাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করুন। আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য চিত্ত প্রশান্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা তাওবা: ১০৩)।

জাকাতের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আল্লাহ্ বান্দাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন, যাতে বান্দা শিক্ষা লাভ করে এবং আদেশ মান্য করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। জাকাত ফরজ হয় ইসলামের পতাকা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন শাশ্বত মানবকল্যাণ সামনে আসে। হিজরি দ্বিতীয় সালে।

জাকাত আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো– পবিত্রতা, বরকত লাভ হওয়া, প্রশংসা করা, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। পবিত্র কোরানের আয়াতকে যদি 'জাকাত' শব্দটির পাশাপাশি রেখে উপলব্ধির প্রয়াস নেওয়া হয় তাহলে সহজেই বোঝা যায়, জাকাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং সমাজ রাষ্ট্রের কল্যাণ করা আবশ্যই সম্ভব। তবে সকল মানুষের জন্য জাকাত দেওয়া জরুরি নয় এবং সকল মানুষ জাকাতের দাবিদার বা হকদারও নয়। প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে কে জাকাত দেবে এবং কে জাকাত পাবে? এ ব্যাপারেও কোরান-হাদিস, ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে ইসলামি শরিয়া আইন পথ দেখিয়ে দিয়েছে। যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় ও স্বাভাবিকতা বিরাজ করে। শরিয়তের পরিভাষায় তিনি জাকাত দিবেন, যিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং এ মালিকানা এক বছরব্যাপী স্থায়ী হলে জাকাত দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনো ফরজিয়াত অস্বীকার করা কুফরি। জাকাত আদায় করা ফরজ। কেউ সময়মতো জাকাত আদায় না করলে, বিনা কারণে বিলম্ব করলে কঠিন গুনাহগার হবে। জাকাতে নিসাব বা কী পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত দিতে হবে এ প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাবে এটিই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, কোনো মুসলমান যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম)

রুপা অথবা সাড়ে সাত তোলা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) সোনা অথবা এর সমান মূল্যের ব্যবসায়িক মাল বা টাকার মালিক হয় তবে জাকাতে নিসাব হয় এবং উক্ত মাল এক বছর কাল তার মালিকানাধীন থাকলে তার ওপর জাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। শরিয়াতের পরিভাষায়, এ ব্যক্তি মালিকে নিসাব। এ মালিকে নিসাব হলেই যে জাকাত ফরজ হলো তা নয়। জাকাত তার ওপর ফরজ যিনি (১) মুসলমান, (২) ক্রীতদাস নন, একজন স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন মানুষ ছাড়া সম্পদের মালিক হতে পারেন না (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানবান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বা পাগল নন)। (৪) মালিকানা স্বত্ব ও দখল স্বত্ব অর্থাৎ উভয় স্বত্বপূর্বক মালিক (৫) ঋণমুক্ত ইত্যাদি। জাকাত দিতে হয়, মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে।

মালিকে-নিসাব বা যিনি জাকাত দিবেন তারও দায় মুক্তি বা ছাড় আছে। সব সম্পদের ওপর জাকাত দিতে হয় না। স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে জাকাত দিতে হবে না। আরো যেসব গৃহে ব্যবহার্য আসবাবপত্র বা দ্রব্যাদির জাকাত দিতে হবে না, তাহলো– লোহা, কাসা, পিতল, জুতা, চিনা বাসন, রাং, কাপড়, ডেগ-ডেগচি, কাঁচপাত্র, বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, মূল্যবান হার ইত্যাদি। তবে এগুলো বাণিজ্যিক পণ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ে কাজে ব্যবহৃত পণ্য হলে, ব্যবসার প্রয়োজনে খাটানো হলে জাকাতের দায় মুক্তি বা ছাড় নেই। যদি বছরান্ত এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তখন জাকাত ওয়াজিব হয়। না দিলে গুনাহ হয়। ব্যবসায়ী পণ্য যদি সোনা বা রুপার নিসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর স্থায়ী হয় তাহলে শতকরা ২.৫০ ভাগ হারে বা চল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে জাকাত দিতে হয়। আর যদি ব্যবসায়ী পণ্য বিভিন্ন প্রকারের হয় তাহলে সবগুলোর সমন্বিত মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে জাকাত দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না। সোনা-রুপা ব্যতীত অন্য মণিমুক্তা ইত্যাদির ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। অলংকার তৈরি করলেও না। তবে ব্যসবায়িক পণ্য হলে অবশ্যই জাকাত দিতে হবে।

পশুর দুধ পান, বাচ্চা বৃদ্ধি বা মোটাতাজা করে মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মাঠে-ময়দানে চরানো হলে এবং এ সকল পশুর নিসাব পরিমাণ মূল্য হলে জাকাত দিতে হবে। তবে বোঝা বহন বা আরোহণের উদ্দেশ্যে হলে জাকাত দিতে হবে না। ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য হলে জাকাত দিতে হবে। গরু বা মহিষ ত্রিশটি না থাকলে বা উট পাঁচটি না থাকলে অথবা চল্লিশটি ছাগল বা ভেড়া বা উট না থাকলে জাকাত হয় না। ব্যবসার জন্য না হলে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার জন্য জাকাত দিতে হয় না। বিভিন্ন মাল যেমন কিছু রুপা, কিছু সোনা ও কিছু ব্যবসায়িক দ্রব্য একত্রিত করে যদি মূল্য নির্ধারণ করলে নিসাবের সমপরিমাণ হয় তবে জাকাত দিতে হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হয় না, জাকাতও দিত হয় না।

প্রতিষ্ঠান-কলকারখানা ও সরকারি শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে যদি ব্যক্তি মালিকানার কোনো অংশ থাকে তাহলে এক বছরের জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হয়। সরকারি অংশের ওপর জাকাত ফরজ হবে না।

শেয়ার একটি ব্যবসায়িক পণ্য। কারণ, এতে কলকারখানা, বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির অংশীদারিত্ব তৈরি হয়। বাজারের শেয়ারের বিক্রয়রের মাধ্যমে লাভের বিষয় জড়িত থাকে। তাই নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত দিতে হবে। যা সুদভিত্তিক তা হারাম ও অবৈধ। আর যা হারাম তার জাকাত প্রশ্নবিদ্ধই শুধু নয়, মীমাংসিত। বাতিল। জাকাতের প্রসঙ্গ অচল।

মৎস্য প্রকল্পে মাছের পুকুর কিংবা পোলট্রি ফার্মে মুরগির ঘর এবং এগুলো পরিচালনার সাজ-সরঞ্জামের জন্য জাকাত দিতে হয় না। তবে ব্যবসা বা বিক্রির নিয়ত থাকলে জাকাত দিতে হয়।

ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ির ওপর জাকাত না থাকলেও বাড়ির ভাড়া বাবদ যে আয় হয় তার ওপর বছরান্তে জাকাত হয়। ঋণ বা হাওলাত বা ধার বাবদ যে টাকা কাউকে নগদ প্রদান করা হয়েছে অথবা ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য যা বাকি রয়েছে এসব অর্থের ওপর বছরান্তে নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত ওয়াজিব হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে হাতে না আসা পর্যন্ত জাকাত হবে না। অবশ্য এটি সরকারি কর্তৃপক্ষের অধীনে হতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করে তবে জাকাত দিতে হবে। বেসরকারি কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিসাবের প্রশ্ন উঠলে জাকাত দিতে হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত, জমাকৃত ও রক্ষিত মালের ওপর জাকাত দিতে হয়। ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে জাকাত প্রযোজ্য। তবে জাকাত প্রযোজ্য নয়– বসবাসের গৃহ, গৃহের আসবাবপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, আরোহণের পশু, ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে। এগুলোর জাকাত ফরজ হবে না। আরো ফরজ হবে না– পরিবারের জন্য সঞ্চিত খাদ্যশস্য এবং সাজসজ্জার জন্য রাখা তৈজসপত্র। জাকাতের আওতায় পড়ে না কারিগর ও পেশাজীবী লোকদের যন্ত্রপাতি। তবে বিয়ে-শাদি, হজ, লেখাপড়া বা যে-কোনো উদ্দেশ্যে কেউ তার অর্থ-সম্পদ যে-কোনো স্থানে স্বনামে বেনামে জমা রাখলে উক্ত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ হবে এবং বছরান্তে জাকাত দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর ফাঁকি দেবার জন্য বেনামে সম্পদ রাখলেও রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ হয়, কখনো বিচার হয়, শাস্তি হয়। এটি ঠিক নয়। কখনো বা সরকার ক্ষমা করলে ক্ষমা পায় কর ফাঁকি অপরাধের। বেনামে সম্পদ রাখলেও জাকাত এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নিসাব পরিমাণ হলে জাকাত দিতে হবে। তবে হারাম উপায়ে যেমন সুদ, ডাকাতি, চুরি, জুয়া, মদ, ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলেও জাকাত ফরজ নয়। ইসলাম এটিকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামি শরিয়া আইন একে নিরুৎসাহিত ও শাস্তিযোগ্য করেছে।

কে কখন কীভাবে জাকাত দিবেন সে বিষয় স্পষ্ট হলেও কাকে জাকাত দেয়া যাবে বা কোন খাতে জাকাত দেয়া যাবে তা অস্পষ্ট রয়েছে। মালিকে নিসাব বা জাকাত প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জাকাত দিতে হবে। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরানের আশ্রয় নিতে হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, সদকা (জাকাত) তো কেবল ফকির (নিঃস্ব), মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এ হলো আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় (সূরা তাওবা: ৬০)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করলে ৮ শ্রেণির ব্যক্তি বা খাত পাওয়া যায়। যেমন–
ক. ফকির: নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় অথবা মালিক হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, খ. মিসকিন: এমন অভাবগ্রস্ত যে খোরাক-পোশাকের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতে, অন্যের মুখাপেক্ষী, গ. আমিন: জাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত কর্মচারী, ঘ. মুয়াল্লাফাতুল কুলূব: ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য যাদের অর্থ দেওয়া হতো, ঙ. গোলাম: গোলাম বা দাসের মুক্তির জন্য, চ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি: ঋণ পরিশোধের পর যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না, ছ. আল্লাহর পথে: সর্ব প্রকার কল্যাণের জন্য আল্লাহর পথে যারা সংগ্রাম করে এবং জ. মুসাফির: যে ব্যক্তির সফরে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনীয় অর্থ নেই।

উল্লিখিত শ্রেণির সকলকে বা যে-কোনো একজনকে জাকাত প্রদান

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি রক্ষায় স্বীকৃতি পেল ২৪ কারখানা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সেক্টরের ২৪টি কারখানাকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রদান করেছে। ২৮শে এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০১৯' উপলক্ষে রাজধানীর কেআইবি মিলনায়তনে আলোচনাসভায় এই পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়।

২৪টি কারখানার মধ্যে বিকেএমই-এ সদস্যভুক্ত ৫টি পোশাক কারখানা হলো– প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেড, উইজডম অ্যাটায়ার্স লিমিটেড, নাফিসা অ্যাপারেলস লিমিটেড, মাদার কালার লিমিটেড, ফতুল্লা অ্যাপারেলস এবং বিজিএমই-এর সদস্যভুক্ত ৭টি পোশাক কারখানা হলো– কমফিট কম্পোজিট নিট লিমিটেড, লায়লা স্টাইলস লিমিটেড, ইপিলিয়ন স্টাইল লিমিটেড, ইকোফ্যাব লিমিটেড, অনন্ত গার্মেন্টস লিমিটেড, ক্রাউন ওয়্যারস প্রাইভেট লিমিটেড, জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড।

ফার্মাসিউটিক্যালস সেক্টরের ৩টি কারখানা হলো: স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, সানোফি বাংলাদেশ লিমিটেড এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ৩টি কারখানা হলো: ম্যাফ সুজ লিমিটেড, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড।

চা শিল্প সেক্টরের ৩টি কারখানা হলো: জেরিন প্লান্টেশন লিমিটেড, মধুপুর টি এস্টেট, শমসেরনগর চা বাগান এবং ৩টি জুট শিল্প কারখানা হলো: জনতা জুট মিলস লিমিটেড, ওহাব জুট মিলস লিমিটেড এবং নর্দার্ন জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড।

প্রতিবেদন: সুষমা ফাল্গুনী

করা যায়। তবে গভীর মনোযোগ ও পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্যের বিষয়টি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ জাকাত পেতে যে আত্মীয়দের মধ্যে সর্বাধিক হকদার তিনি হলেন জাকাতদাতার (পর্যায়ক্রমে) ১. আপন ভাই, আপন বোন, ভাইবোনের সন্তানগণ, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, রক্ত সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়, প্রতিবেশী, ২. নিকটজন বিবেচনায় সাধারণ মূর্খ ফকিরের চেয়ে দ্বীনদার ও দ্বীনি শিক্ষার শিক্ষার্থীগণ জাকাত পাওয়ার হকদার, ৩. ঋণগ্রস্ত অভাবী সাধারণ অভাবীর চেয়ে বেশি হকদার। তবে যাকেই জাকাত দেয়া হোক না কেন, স্মরণ রাখতে হবে– জাকাতগ্রহীতা ব্যক্তিকে যেন এ পরিমাণ জাকাত দেওয়া হয় যাতে ঐ দিন তাকে আর অন্যের নিকট হাত পাততে না হয়। এমনটি মুস্তাহাব। আর স্মরণ রাখা প্রয়োজন– মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পুল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি জনহিতকর কাজে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েজ নয়। কারণ, কোনো হকদার বিশেষ ব্যক্তি নয়। গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ধনী-গরিব সকলেই এটা ব্যবহার করে। তবে জাকাতের টাকায় ঔষধ কিনে সরাসরি গরিব রোগীর জন্য ব্যয় করা যাবে। এমনটি জায়েজ।

জাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর দ্বারা সমাজের উঁচুনীচু ভেদাভেদ দূর করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে ওঠে। কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না– এ ধরনের স্লোগান অকার্যকর করা হয়েছে। সকলের কথা বলা হয়েছে। একজনের সম্পদের মধ্যে অন্যজনের অধিকারের বার্তা হলো জাকাত-সদকা।

মাল বা সম্পদের পবিত্রতার জন্য জাকাত প্রদান করা ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কোরানে যে কাজগুলো করার জন্য আদেশ-নির্দেশ রয়েছে অথবা যে কাজগুলো না করার জন্য নির্দেশ রয়েছে তা পালন করা ফরজ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি জাকাত। একজন মুসলমান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে, জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাতবাসী হতে পারে, মানবকল্যাণ ও বিশ্বসভ্যতায় নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারে জাকাত প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সকল ধর্ম-বর্ণ-মত-পথ-সম্প্রদায়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর এই লাল-সবুজের পতাকা শোভিত বাংলাদেশের উন্নয়ণ ও অগ্রগতিতে জাকাত ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলছে। যেকোনো ধর্মীয় উৎসব বিশেষ করে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের এ সময়ে একে-অন্যের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হয়। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক-অর্থনীতির ভিত মজবুত করারও সুযোগ আসে। জাকাত যার ওপর ফরজ, তিনি জাকাত প্রদান করে তৃলমূল অর্থনীতির চাকা আরো সচল করবেন। যা জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হবে। মাথাপিছু আয় বাড়বে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক প্রবাহ সৃষ্টি হবে। আল্লাহর নবি (সা.) ভিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেছেন, তিনি কাঠুরিয়ার জন্য কুঠারের ব্যবস্থা করেছেন। স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। জাকাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ হয়, ঋণ মুক্ত হয়, নতুনভাবে কিছু করা যায়। ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনা কিংবা মধুর সম্পর্ক নির্মাণের শিক্ষাও রয়েছে।

এ বছর সদকাতুল ফিতরার হার জন প্রতি সর্বোচ্চ ১,৯৮০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৭০ টাকা। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি আটা, খেজুর, কিসমিস, পনির ও যবের যে-কোনো একটির দ্বারা ফিতরা প্রদান করতে পারে।

লেখক: কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আইনজীবী

কৃষিজমি সুরক্ষায় ১০ প্রস্তাবনা

খসড়া কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১৫ তে সংযোজনের জন্য ১০ দফা প্রস্তাবনা দিয়েছে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইনসিডিন বাংলাদেশ।

প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছে:

১. এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কর্তব্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

২. নতুন করে জেগে ওঠা জমিকে কৃষিজমি হিসেবে বিবেচনা করা এবং বন-সন্নিহিত অঞ্চল বাদে অন্যান্য এলাকায় জেগে ওঠা ভূমির কমপক্ষে ৮০ শতাংশ কৃষি জমির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. এই আইনে খাস কৃষি জমিতে ভূমিহীনের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে বিদ্যমান নীতির সঙ্গে সমন্বিত করা যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত হয়।

৪. কৃষি বৈচিত্র্য সুরক্ষা, নৃগোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৫. প্রস্তাবিত আইনের সংজ্ঞায় ফসলি জমির আওতায় চা উৎপাদনে ব্যবহৃত ভূমি, ব্যক্তিগত বনভূমি, ফল বাগান সৃজনে ব্যবহৃত ভূমি প্রভৃতি উল্লেখ থাকলেও একই আইনের ৪নং ধারার ২ (ক) অংশে কৃষি জমি ব্যতীত অন্যান্য জমি হিসেবে চা, ফল, রাবার ও বিশেষ ধরনের বাগানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া এ সব জমিতে কোন প্রকার ভূ-প্রকৃতিগত পরিবর্তন আনা যাবে না বা ভরাট করে বা বিনষ্ট করে আবাসিক এলাকা স্থাপন করা যাবে না বলা হলেও এই জমিগুলো কৃষিজমি এবং কৃষি বহির্ভূত জমি উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিতর্ক নিরসনকল্পে এই সকল জমিগুলো কৃষি জমির আওতাভুক্ত করে একক কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করাই সমীচীন হবে।

৬. ৪নং ধারা ১(খ)-এ অনুযায়ী আমরা কৃষিজমি সুরক্ষার যে সংজ্ঞা পাই তাতে রাসায়নিক ও অন্যান্য দূষণজনিত কারণে কৃষি জমির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়নি। এটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার।

৭. উন্নয়ন প্রকল্প ও শিল্প কলকারখানা, আবাসন প্রভৃতি অকৃষি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র যেমন বাধ্যতামূলক, তেমনি কৃষি ও ফসলী জমির কোন ক্ষতি হচ্ছে না, এমন ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন রয়েছে।

৮. প্রস্তাবিত আইনের ধারা-১২ অপরাধ, বিচার ও দণ্ডের বিধান তুলে ধরেছে। কিন্তু দণ্ডের পাশাপাশি প্রণোদনা প্রদানের আইনি বিধানও জরুরি।

৯. খসড়া আইনের ধারা-৭/৩ ভূমি জোনিং'এর যে ক্ষেত্রসমূহের প্রস্তাব করেছে তার আওতায় পরিবেশগত বিপন্ন এলাকাকে (এঃ) চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতসমূহ মোকাবেলায় কৃষিজমি সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতদর্শী হতে হবে (যেমন হাইড্রোফনিক এলাকা চিহ্নিতকরণ) এবং আপদকালীন সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১০. পরিশেষে আইনটির শিরোনামে 'ভূমি ব্যবহার' এর বদলে 'টেকসই ভূমি ব্যবহার' অভিধা প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং বর্তমান ভূমি ব্যবহার যেন আগামী প্রজন্মের কৃষি স্বক্ষমতা ব্যাহত না করে- এ বিবেচনায়; ধারা-২'এ তা সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: আমাদের গর্ব

মোহা. আব্দুল মানিক

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে এঁকে দেয় পদচিহ্ন। চন্দ্র বিজয়ের পর মানুষ অন্য গ্রহেও মহাকাশে অভিযান পরিচালনা করছে। ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত চন্দ্র বিজয়ই ছিল মহাকাশ বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সাফল্য। কিন্তু ১৯৯৭ সালের ৫ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের 'পাথফাইন্ডার' মঙ্গলগ্রহে অবতরণের পর মহাকাশ বিজ্ঞানের সাফল্য সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়। মহাকাশ বিজ্ঞানের বন্ধুর পথে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে 'পাথফাইন্ডার'।

আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে, যা ঐ দেশের মর্যাদা আর সক্ষমতার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে; যেমন- সাবওয়ে, সাবমেরিন, বুলেট ট্রেন, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার, স্বাস্থ্যসেবা, বার্ষিক মাথাপিছু আয়, গড় আয়, সমুদ্র বন্দরের অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক অগ্রসর হবে। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আনন্দ ও গর্বের বিষয় হলো বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ। এর মাধ্যমে বিশ্বের উন্নত স্যাটেলাইট ক্ষমতাধর দেশের তালিকায় যুক্ত হলো বাংলাদেশ। স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণের পরপরই সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'মহাকাশে আজ উড়ল বাংলাদেশের পতাকা। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম।'

উৎক্ষেপণের মুহূর্তটি স্পেসএক্সের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় কোটি কোটি বাংলাদেশি নির্ঘুম চোখে তা প্রত্যক্ষ করেন। ঘটনাস্থল কেনেডি স্পেস সেন্টারের সামনে বাঙালিরা সমবেত হয়ে গাইতে থাকেন জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' উৎক্ষেপণস্থল থেকে ১৩ হাজার কিলোমিটার দূরের বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষও তখন তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়। শুরু হয় চিৎকার, হর্ষধ্বনি ও আনন্দাশ্রুর বান। এ যেন এক হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

উৎক্ষেপণের পর ৩ হাজার ৭০০ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইটটি বহনকারী রকেট ফ্যালকন-৯ সোজা আকাশে উঠে যায়। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে সেদিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে হাজির ছিলেন অনেক বাঙালি। তাদের কেউ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, আবার কেউ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়সহ সরকারের একটি প্রতিনিধিদল।

২০১৮ সালের ১১ই মে মহাকাশের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে আবার পিছিয়ে যায় বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ। কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশ সময় ১১ই মে দিবাগত রাত ৩টা ৪৭ মিনিটে উৎক্ষেপণ হওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১ মিনিট আগে ৩টা ৪৬ মিনিটে এসে থেমে যায় আয়োজন। স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্ভাব্য 'সামান্য' কারিগরি ত্রুটির আশঙ্কা থাকায় উড়ছে না বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। ১২ই মে ২০১৮ রাত ২টা ১৪ মিনিটে তীব্র আগুনের হুলকা ছুটিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মহাকাশের পথে ডানা মেলল বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১'।

স্যাটেলাইটটি কার্যকর হওয়ার পর এর নিয়ন্ত্রণ যায় যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি এবং কোরিয়ায় অবস্থিত তিনটি গ্রাউন্ড স্টেশনে। এই তিনটি স্টেশনের মাধ্যমে স্যাটেলাইটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস এটি পর্যবেক্ষণ করছে। থ্যালেস প্রথম তিন বছর বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে স্যাটেলাইটটি পর্যবেক্ষণের কাজ করবে। এই সময়ে সক্ষমতা তৈরি হয়ে গেলে এর দেখাশোনার দায়িত্ব বাংলাদেশের ওপরই ছেড়ে দেবে ফরাসি কোম্পানিটি।

১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার ১নং বেতবুনিয়া ইউনিয়নে দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্‌বোধনের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে মহাকাশ জয়ের সূচনা করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নানা চড়াই-উতরাই পেড়িয়ে দীর্ঘ ৪৩ বছর পর লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

এ স্যাটেলাইটে ৪০টি ট্রান্সপন্ডার সক্ষমতা রয়েছে। প্রতিটি ট্রান্সপন্ডার প্রায় ৩৬ মেগাহার্টজ বেতার তরঙ্গের সমপরিমাণ। অর্থাৎ ৪০টি ট্রান্সপন্ডার থেকে পাওয়া যাবে প্রায় এক হাজার ৪৪০ মেগাহার্টজ পরিমাণ বেতার তরঙ্গ। এর মধ্যে ২০টি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। আর বাকি ২০টি ট্রান্সপন্ডার ভুটান, নেপাল ও এশিয়ার অন্য অংশে কিরগিজস্তানের মতো দেশেও ভাড়া দেওয়া যাবে।

৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে ২৬টি হচ্ছে কেইউ ব্যান্ডের এবং ১৪টি

সি ব্যান্ডের। গাজীপুর ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপিত দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। এর মধ্যে গাজীপুর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এবং বেতবুনিয়া বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে পৃথক বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড নামক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পালটে দেবে আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তিসহ আর্থসামাজিক খাত। এর প্রধান প্রধান গুরুত্বসমূহ নিম্নরূপ:

১. বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট আমাদের টেলিকমিউনিকেশন, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আর ইন্টারনেটের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। আমাদের দেশেরই অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট থাকায় স্যাটেলাইট ভাড়া হিসাবে দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমে এখন এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে। বেসরকারি চ্যানেলগুলোকে আগে প্রতিমাসে ৩০ হাজার ডলার খরচ করতে হতো ফ্রিকোয়েন্সি কিনতে; অত্যধিক এ ব্যয় আর করতে হবে না। ফলে সাশ্রয় হবে প্রচুর অর্থ। আর তারচেয়ে বড়ো কথা দেশের স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের কাছে ফ্রিকোয়েন্সি বিক্রির মাধ্যমে দেশের টাকা দেশেই থাকবে।

২. দেশে টেলিকমিউনিকেশন, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আর ইন্টারনেটের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিন্তের পাশাপাশি স্যাটেলাইটের তরঙ্গ ভাড়া দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ট্রান্সপন্ডার বাংলাদেশের জন্য রাখা হবে, বাকি ২০টি ট্রান্সপন্ডার বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রির জন্য সংরক্ষিত আছে। শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমারের কাছে এ স্যাটেলাইট সার্ভিস বিক্রি করে আমরা বছরে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব।

৩. এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-রিসার্চ, ভিডিও কনফারেন্সিং, প্রতিরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সব সেক্টরেই ই-সেবা Massive Boost Up করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বহাল রাখবে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। বিশেষ করে দেশের দুর্গম দ্বীপ, নদী ও হাওর এবং পাহাড়ি অঞ্চলে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা চালু রাখা সম্ভব হবে।

৪. সামরিক খাতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এটি আমাদের অনেক বড়ো প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হয়ে দাঁড়াবে। জঙ্গি বা সন্ত্রাসীরা অনেক সময় দুর্গম এলাকাতেও স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে। নিজস্ব স্যাটেলাইট না থাকায় আমাদের চৌকষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষেও এদের অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। শত্রুর অবস্থান জানার জন্য পরিদর্শন-পরিক্রমা, ছবি তোলার কাজ, স্থল সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য গোয়েন্দা তথ্য সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা পেতে এমনকি পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং আসন্ন হামলার আগাম খবরাখবর সরবরাহের কাজেও এই স্যাটেলাইট হবে আমাদের প্রধান গুপ্তচর। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আনতে ও সন্ত্রাসীদের ধরতে এ স্যাটেলাইট রাখবে বিশাল ভূমিকা।

৫. জাহাজের দিক নির্দেশনায়, গ্লোবাল পজিশনিং বা জিপিএস, ডিজিটাল ম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে গামা রে এক্সপ্লোশন ডিটেকশন করতে আমাদের সাহায্য করবে এবং বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। মাটি ও পানির নিচে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিভিন্ন খনি শনাক্তকরণের মাধ্যমে নতুন সম্পদের দুয়ার খুলে দেওয়ার কাজে সাহায্য করবে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট।

৬. মহাকাশ বা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় এক বিশাল দুয়ার উন্মোচন করবে বঙ্গবন্ধু-১। বিশেষ করে বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী বা মহাকাশ বিজ্ঞানে ক্যারিয়ার গড়তে, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাওয়া শিক্ষার্থীরা নতুন এক ডাইমেনশন পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মহাকাশ বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হবে। হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে এই এক স্যাটেলাইট দিয়েই। এই স্যাটেলাইটের হাত ধরেই একদিন হবে আমাদের নিজস্ব গবেষণা সংস্থা।

৭. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া যাবে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ। ফলে ব্যান্ডউইথের বিকল্প উৎসও পাওয়া যাবে। দেশের দুর্গম অঞ্চলে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব হবে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্বাভাবিক টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও উদ্ধারকর্মীরা স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ রেখে দুর্গত এলাকায় কাজ করতে সক্ষম হবেন।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ বাংলাদেশের মহাকাশ গবেষণায় একটি বিশাল মাইলফলক। প্রযুক্তির এই প্রাগসর সময়ে এ ধরনের স্পেস স্টেশন প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন আরো গতিশীল, আরো ছন্দময় করবে। বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির সঙ্গে সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ করবে। সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বিপ্লব ঘটাবে। অর্থনৈতিক প্রগতি বাড়াবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করবে।

উৎক্ষেপণের এক বছর পর ১৯শে মে ২০১৯ বাণিজ্যিক সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১)'। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আরো এক নবতর অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছে। সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এভাবে দেশ এগিয়ে যাবে বিশ্ব দরবারে, বাংলাদেশ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের এ অকল্পনীয় উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্যালুট জানাই।

লেখক: ব্যবস্থাপক, সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, বগুড়া

নিবন্ধ

বাবা দিবস ও দিবসবিহীন বাবারা

নাসরীন মুস্তাফা

প্রতিবছরের জুন মাসের তৃতীয় রবিবার সারা বিশ্বে পালিত হয় 'বাবা দিবস'। যদিও এই দিনটিসহ বছরের প্রতিটি দিনই বাবা থেকে যান বাবা, ভোলেন না– তিনি তার সন্তানের বাবা। প্রতিটি দিনই বাবা উন্মুখ হয়ে থাকেন সন্তানের মুখ থেকে বাবা ডাক শোনার জন্য, খুব গোপনে বুকের গভীরে বইতে থাকা স্নেহের ফল্গুধারা কাউকে বুঝতে না দিয়ে কঠিন কঠোর দায়িত্ববান একজন মানুষ হয়ে থাকেন যাতে তার সন্তানরা মানুষ হয়। বড়ো হতে হতে সন্তানরা নিজস্ব ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়ে, ভুলে যায় ছোটোবেলার মতো বাবার হাত আঁকড়ে ধরে থাকার অভ্যেস। বড়ো হতে হতে সন্তানরা মানুষ হতেই হয়ত ভুলে যায়। নইলে, আপাত-কঠোর-কঠিন মুখটার আড়ালে ঢাকা স্নেহময় বাবার প্রতীক্ষায় কাতর চোখ দুটো ভুলে থাকে কী করে! অথচ কী আজব কাণ্ড, এই সন্তান ততদিনে নিজেও বাবা হয়ে নিজের সন্তানের জন্য তার বাবার মতোই আকুল হয়ে ওঠে! জীবনের চলমান শেকলে বাঁধা পড়ে এ কালের বাবা আর সে কালের বাবা এরপরও কেন যেন হাতে হাত রাখতে পারেন না। নইলে এ কালের বাবা নিজের সন্তানের জন্য সে কালের বাবার মতোই অস্থির হয়ে ওঠেন এবং নিজের সেকালের বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখবেন কি না ভাবছেন বা কেউ কেউ রেখেও দিচ্ছেন।

মধ্যযুগে ক্যাথলিক ইউরোপে বাবা দিবসের যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। ক্যাথলিক বিশ্বাসে সেইন্ট জোসেফ হলেন যীশু খ্রিষ্টের বাবা। আর তাই সেইন্ট জোসেফ হলেন নিউট্রিটর ডোমিনি বা নারিশর অব দ্য লর্ড, অর্থাৎ প্রভুকে তিনি যত্ন করে বড়ো করেছেন। রাজা হেরডের আক্রমণ থেকে আগত সন্তানকে বাঁচাতে অন্তঃসত্ত্বা মেরিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন জেরুজালেমের দিকে। সেখানে নিরাপদে জন্ম নেন যীশু। গরিব কাঠুরে বাবা সন্তানকে মানুষ করতে অনেক কষ্ট করেছিলেন। সব বাবারাই আসলে সেইন্ট জোসেফের মতো কষ্ট করেন, আর তাই সন্তানের উচিত বাবার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। এই বার্তাটির জাগরণ ঘটাতেই 'ফাদার্স ডে'র প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে স্প্যানিশ আর পর্তুগিজরা যখন নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের কাছ থেকে নানা দেশে চলে আসে বাবা দিবস পালনের রীতিটি। তবে ১৯০৭ সালে এসে বাবা দিবস এখনকার সময়ে ব্যাপ্তি লাভ করে এক বাবার রাজকন্যার হাত ধরে। নাম তাঁর গ্রেস গোল্ডেন ক্লেটন। থাকতেন আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশে। ঐ বছর ভার্জিনিয়ার মোনোংয়াতে ভয়াবহ খনি বিস্ফোরণে প্রাণ হারান সাতে তিনশ'র বেশি পুরুষ খনিশ্রমিক। তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সন্তানের বাবা। গ্রেস গোল্ডেন ক্লেটন বললেন, খনিশ্রমিক নয়, মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে বাবারা, প্রায় এক হাজার শিশু চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে তাদের বাবাকে। ক্লেটনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তিনি খনি বিস্ফোরণে শহিদ বাবাদের সম্মানে ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই (রবিবার) বাবা দিবস হিসেবে পালন করার জন্য স্থানীয় মেথোডিস্ট গির্জার যাজক বরাবর আবেদন করেন। প্রশ্ন জাগছে, কেন ৫ই জুলাইয়ের কথা বলেন ক্লেটন? বলেন, কেননা ঐ দিনটি ছিল তাঁর নিজের বাবার জন্মদিন। বাবা বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু বাবার মৃত্যু দিন নয়, বাবার জন্মদিনকে বিশেষ দিন হিসেবে পালন করতে চেয়েছিলেন বাবার রাজকন্যা। পেরেছিলেনও। প্রতিবছর বাবা দিবসে গির্জায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন হতে থাকে।

এই দিবসটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ ঘটে আরেক বাবার রাজকন্যার হাত ধরে। তিনি সোনোরা স্মার্ট। ওয়াশিংটনে থাকতেন। ১৯০৯ সালের কথা। তখন ওয়াশিংটনে মা দিবস পালিত হলেও বাবা দিবস বলে কিছু ছিল না। সোনোরা স্মার্ট বাবা দিবস পালনের আবেদন জানান। দিনটি হতে হবে ৫ই জুন, তাও বলেন তিনি। ৫ই জুন কেন? কেননা, ঐদিন ছিল সোনোরা স্মার্টের বাবার জন্মদিন। তবে হাতে সময় কম ছিল বলে ঐ বছরের ১৯শে জুন প্রথম পালিত হয় 'বাবা দিবস'। এর চার বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের সংসদে বাবা দিবসকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করতে একটি বিল উপস্থাপিত হয়। ১৯১৬ সালে আমেরিকার সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বিলটি পাশ করেন। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্ট কেলভিন ক্যুলিজ বাবা দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

বাবা দিবস পালনের দিন কোথাও কোথাও ভিন্ন হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। যে যেদিন বাবাকে নিয়ে উৎসব করতে চান, করুন না। প্রতিদিন যেহেতু বাবার প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এই একটি দিনে বিশেষভাবে তাকে মনে করার রীতিতে ক্ষতি নেই, লাভ আছে। একদিন তো অন্তত বাবারা দেখেন, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার রাজপুত্র-রাজকন্যারা। এই দিনটিতে সত্যি সত্যি বাবা হয়ে যান রাজা।

আমাদের দেশে এই দিনটির উপস্থিতি খুব বেশি দিনের নয়। এই দিবস পালনের গুরুত্ব বাড়ছে। সম্প্রতি ঘোষণা এসেছে, বাবা-মার ভরণপোষণের জন্য আইন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ সরকার। পারিবারিক বন্ধন বাঙালি সংস্কৃতির সৌন্দর্য হলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে বড়ো হতে না হতেই সন্তান ধরে নিচ্ছে, তার জীবন সে তার মতো করে কাটাবে। একক পরিবারে সুখ খুঁজতে চাইছে। আধুনিক যুগের সাথে পাল্লা দিতে পারা সুপারসনিক সন্তান বানানোর তাড়নায় ব্যাকডেটেড বাবা-মাকে কাছে রাখতে অনীহা প্রকাশ করছে। এর ফলে বাবা-মা নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সন্তানটিও বঞ্চিত হচ্ছে পূর্বপুরুষের মমতার নির্যাস থেকে। শেকড় ছাড়া গাছের মতো এ কালের সন্তানদের তাই কোনো অতীত নেই, ফলে বর্তমানও অস্থিরতায় ভরপুর। সে কেবলি সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। যার অতীত নেই, বর্তমান অস্থির, তার ভবিষ্যৎ সোনালি হবে কোন্ জাদুমন্ত্রে? শেকড় ছাড়া গাছ কি মহীরুহ হতে পারে কখনো? এই বাস্তবতাবোধ থেকে সরকার আইন করে নিশ্চিত করতে চাইছেন বাবা-মায়ের শেষ দিনগুলো। যদিও এও সত্য, আইনের চেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে সন্তানের নিখাদ ভালোবাসা। ভালোবাসার শক্তিতেই সন্তান পরম মমতায় আগলে রাখবে বৃদ্ধ বাবা-মাকে, ঠিক যেভাবে তার অসহায় শৈশবে বাবা-মা তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং এজন্য তারা কোনো দিবস চাননি, সব দিবসেই তারা ছিলেন সন্তানের অবলম্বন। এখন কেন অপেক্ষায় থাকতে হবে, কবে আসবে মা দিবস, কবে আসবে বাবা দিবস?

দিবসহীন বাবাদের জন্য অনেক ভালোবাসা।
বাবা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই সব বাবাদের।

লেখক: সম্পাদক, নবারুণ, ডিএফপি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনে সরকারের সাফল্য

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকার। একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিবেশ রক্ষায় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার বিগত ১০ (দশ) বছরে এ সেক্টরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে, যা দেশের অঙ্গন ছাপিয়ে বহির্বিশ্বেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অর্জিত সাফল্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রধানমন্ত্রীর চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার অর্জন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশের নেওয়া উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো সাফল্য

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ ইউএনএফসিসিসি'র ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্যপদ এবং আরো ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। এগুলো হচ্ছে– বন ব্যবস্থাপনায় ইকুয়েটর প্রাইজ, উপকূলীয় বনায়নের জন্য আর্থ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, বন সংরক্ষণের জন্য ওয়াঙ্গারি মাথাই অ্যাওয়ার্ড এবং সিএফসি গ্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ওজন কমিটির স্বীকৃতি সনদ।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

❑ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান অব ২০০৯' শিরোনামে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে।

❑ বর্তমান সরকার পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আর্টিকেল ১৮(ক) সংযোজন করেছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ অর্জন করেছে 'The Global Green Award-2014'।

❑ গাজীপুরে প্রায় ৪ হাজার একর এলাকাজুড়ে প্রায় ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক'।

❑ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অধিকতর অর্থায়নের উদ্দেশ্যে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার (৫৬ হাজার কোটি টাকা) অর্থায়নের পরিকল্পনা করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় একটি জাতীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan-CIP) তৈরি করেছে।

❑ বৃক্ষরোপণে গুরুত্ব আরোপের ফলে দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বেড়েছে। ২০০৮ সালের ৯.৫ শতাংশের স্থলে ২০১৮ সালে ১৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

❑ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ রাসেল এভিয়ারি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ঝুঁকি মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম

❑ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা– National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব বাজেট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত (১০ বছরে) ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর CDM (Clean Development Mechanism) এক্সিকিউটিভ বোর্ড, এডাপটেশন কমিটি ফান্ড বোর্ড এডাপটেশন কমিটি, Compliance কমিটি এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপার্ট-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ২০১২ সালে রিও ডি জেনারিওতে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও+২০ সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

❑ সরকার অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে National Adaptation Programme of Action (NAPA) update-করেছে এবং NAPA-এর আওতায় বাংলাদেশ ১৮টি অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কার্যক্রম (প্রকল্প) চিহ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Least Developed Countries Fund (LDCF) থেকে NAPA-এ চিহ্নিত প্রথম অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প Community Based Coastal Afforestation প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বন অধিদপ্তর ৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য 'সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন' (Second National Communication) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

❑ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় দেশের সকল সিটি করপোরেশনসহ পৌরসভাসমূহের জৈব আবর্জনা থেকে গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রোগ্রামেটিক সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ ওজনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে সরকার ১লা জানুয়ারি ২০১০ থেকে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি), কার্বন, টেট্রাক্লোরাইড (সিটিসি) এবং মিথাইল ক্লোরোফরম (এমসিএফ) ১০০% ফেইজ আউট নিশ্চিত করেছে। এজন্য মন্ট্রিল প্রটোকল সচিবালয় থেকে বাংলাদেশের অনন্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে একটি ক্রেস্ট প্রদান করে।

❑ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় ২০১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২১তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP21) এ সকল সদস্য রাষ্ট্রের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম. পি. প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

❑ সরকার ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৪৬.০৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

❑ সরকারি নির্দেশনায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে দেশের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪২৭৭টি জিগজ্যাগ, ৬০টি হাইব্রিড হফম্যান, ৫৭টি টানেল কিলন এবং ৫টি ভার্টিক্যাল শ্যাফ্‌ট/অন্যান্য পদ্ধতির আধুনিক ইটভাটা স্থাপিত হয়েছে।

❑ ৩১৮.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (কেইস) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

❑ ঢাকা শহরের চারপাশের নদীসমূহকে দূষণ থেকে রক্ষার জন্য বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বর্ণিত নদীসমূহের পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বিগত সরকারের সময়ে যেখানে মাত্র ১১৬টি শিল্পকারখানায় ইটিপি স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে বর্তমান সরকারের পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুফল হিসেবে দেশের ২০১৭টি ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্পকারখানার মধ্যে ১৬১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, যা বেপরোয়া দূষণ প্রশমন সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

❑ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পবর্জ্য থেকে পানি পরিবেশ দূষণের দায়ে ৩৯৮৪ শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ২৬৩.০২ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫৯.৪৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে, বাকিগুলো আদায়ে প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। পানি দূষণের দায়ে ১৪২৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮০.৪২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ১১১.১০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

❑ শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনসহ অন্যান্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে।

❑ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের অবাধ ব্যবহার বন্ধ এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া নিঃসরণ রোধে জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে যথাক্রমে ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে ও ৮৭৬.২১ টন পলিথিন জব্দ করা হয়েছে এবং ৪৭টি অবৈধ পলিথিন কারখানা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

❑ জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হ্রাসকরণের জন্য ৭ হাজার ৮ শত বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার উন্নত চুলা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ১২ হাজার ৮ শত ৭২টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

❑ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে Community Based Adaptation in the Ecologycally Critical Areas Through Biodiversity Conservation and Social Protection শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ Ecologycally Critical Areas (ECA) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে গঠিত সমিতি পরিচালনার জন্য 'এনডৌমেন্ট ফান্ড' (Endowment Fund) গঠন ও তা ব্যবহারের জন্য গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে।

❑ প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে মাইক্রোক্রেডিট প্রদানের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ দেশের বায়োডাইভারসিটি সংরক্ষণের জন্য জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক ২০২০ সাল পর্যন্ত করণীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করে 'Biodivdersity National Assessment and Programme of Action 2020' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

❑ পরিবেশসম্মতভাবে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সরকার 3R (Reduce, Reuse & Recycle) স্ট্র্যাটেজি এবং কঠিন আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করেছে ।

❑ শহরের বর্জ্য থেকে গ্রিন হাউস গাস উদ্‌গীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে শহরগুলোর (সিটি করপোরেশন/পৌরসভা) জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে শহরের বর্জ্য থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস উদ্‌গীরণ হ্রাসের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কর্মসূচি

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের বন ব্যবস্থাপনাকে কার্বন ট্রেডিংয়ের উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আগর গাছের উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার

বাংলাদেশে আগর শিল্প একটি সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী শিল্প। আগর শিল্পকে উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বন গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত জাতের আগর বীজ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট আগর গাছের কাঠ থেকে আগরের তেল নিষ্কাশনে উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষতা ও সাফল্য

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে একটি তেলবাহী জাহাজের ট্যাংকার থেকে তেল নিঃসরণ সফলভাবে মোকাবিলা করা হয়। এর ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

বাঘ শুমারি

বৈজ্ঞানিক উপায়ে (ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতি) বাঘ শুমারি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি আমাদের সুন্দরবনের বাঘ সুরক্ষার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

সংগ্রহে: সম্পাদনা বিভাগ

ভোক্তা অধিকার আইন এবং নিরাপদ মানসম্পন্ন পণ্য

ম. জাভেদ ইকবাল

নিরাপদ, গুণগত মানসম্পন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য ও সেবা পাওয়া প্রত্যেক ভোক্তার অধিকার। ভোক্তা অধিকার বর্তমান সময়ে একটি আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভোক্তা অধিকার নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল ও ক্রমবিকাশমান বাজার ব্যবস্থাপনার দেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ প্রতিরোধ একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। বেসরকারি সংস্থা ক্যাব (কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে নবম জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১০ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। আইনটি বাস্তবায়নে জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে সরকারের দুটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি কাজ করে যাচ্ছে। একটি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, অন্যটি জেলা প্রশাসন। অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, বিএসটিআই, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ, ক্যাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সহায়তা করে থাকে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা জরিমানা আরোপ, লাইসেন্স বাতিল এবং সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে অধিকতর শাস্তির জন্য মামলা জুডিশিয়াল কোর্টে প্রেরণ করতে পারেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে যে-কোনো শাস্তি প্রদান করতে পারেন। বর্তমানে দুটি পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। সরাসরি বাজার মনিটরিং, আর অন্যটি হলো ভোক্তার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি।

ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে একজন ভোক্তা পণ্য ক্রয় করে যদি ওজনে কম, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য, ভেজাল পণ্য, বাটখারায় কম ওজন, নকল পণ্য, মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, অতিরিক্ত দাম নেওয়া, অবৈধ উপায়ে পণ্য উৎপাদন, পণ্যের মোড়কে বিস্তারিত বিবরণ না লেখা থাকে- এগুলোর শিকার হন তাহলে ভোক্তা হিসেবে তিনি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপযুক্ত প্রমাণসহ (দ্রব্য ক্রয়ের রসিদটি হতে পারে একটি উপযুক্ত প্রমাণ) লিখিত অভিযোগ করতে পারবেন। এই আইনের অন্যতম একটি দিক হলো, যদি বিক্রেতা দোষী প্রমাণিত হয় তবে বিক্রেতার ওপর জরিমানাকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ ভোক্তাকে প্রদান করা হবে। অর্থাৎ আইনটি অত্যন্ত জনবান্ধব। এই আইনের দ্বারা জনগণকে অনেকখানি ক্ষমতায়িত করা হয়েছে।

ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা একটি ত্রিপাক্ষিক বিষয় যার সাথে জড়িত রয়েছে উৎপাদনকারী, বিক্রেতা এবং ভোক্তা বা ক্রেতা। শুধু জেল-জরিমানা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য ভোক্তা তথা সাধারণ জনগণকে যেমন সচেতন হতে হবে একইভাবে উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাকেও সচেতন হতে হবে। কারণ আমরা সকলেই ভোক্তা। একমাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা এবং ভোক্তার সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টাই ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। এ কারণে বাজার মনিটারিংয়ের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ তথা ভোক্তা এবং উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের সচেতন করার বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে শহর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের হাটবাজার পর্যন্ত পোস্টার, প্যাম্পলেট, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা, গণশুনানি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিবছরই হোটেল রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, বেকারি মালিক সমিতি, ফল ব্যবসায়ী সমিতি, মিষ্টি ব্যবসায়ী, কসমেটিকস দোকান মালিক সমিতি, এলপিজি ডিলার সমিতি ও পরিবেশক সমিতি, ইলেক্ট্রনিক পণ্য সামগ্রী ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মতবিনিময় করছে। জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আনসার ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে এবং বাজার এলাকায় মতবিনিময় করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটিকে কার্যকর করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তারপরও প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন, ইটের পরিমাপে কম দেওয়া, পেট্রোল পাম্পে জ্বালানি কম দেওয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অননুমোদিত ঔষধ বিক্রি করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ও সার বিক্রয়, মেয়াদ উত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার, অধিক বিদ্যুৎ বিল, চালের বস্তা ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত, নকল ঔষধ ও কসমেটিকস তৈরি ও বিক্রয়, খাদ্যপণ্যে ফরমালিনের ব্যবহার, পঁচা-বাসি খাদ্যদ্রব্য বিক্রি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ ও তৈরি, কলা পাকাতে কার্বাইড ব্যবহার, মোবাইল ডাটা প্যাকেজ নিয়ে প্রতারণা, মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারণা, পরিবহণ খাতে স্বেচ্ছাচারিতা, দই ও মিষ্টির প্যাকেটের অধিক ওজন, সোনালি মুরগিকে দেশি মুরগি বলে বিক্রি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে মেয়াদ উত্তীর্ণ কেমিক্যাল ব্যবহার, প্রশিক্ষণবিহীন টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি।

বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মার্ট পণ্য এবং ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থার পরিসর অত্যন্ত সীমিত হলেও ধীরে ধীরে পরিধি বাড়ছে। ইতোমধ্যে ই-কমার্স, ই-স্বাস্থ্য, ই-টিকেটিং, ই-ভ্রমণ, ই-সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষত্রে যথাযথ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন সেট, ইন্টারনেট ডাটা প্যাকেজ, রাইড শেয়ারিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ই-ব্যাংকিং, এটিএম কার্ড, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ স্মার্ট ডিভাইসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা যেই হই না কেন সকলের আগে আমরা সবাই ভোক্তা। সবাই মিলে নিজেদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করার জন্য একসাথে কাজ করে যাওয়া হোক সকলের মূল লক্ষ্য। জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আইনটি বাস্তবায়নে জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

তোমরা আরশিনগর চেনো

ফারুক নওয়াজ

শহরের শেষ বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে আমি চলে গেলাম মহল্লার মাঝখানে
বাগানবিলাসে সাজানো প্রবেশদ্বার... বাড়িটা কী আমার জন্য বরাদ্দ?
আমি চেয়েছিলাম একটু নির্জনতা, একটু ছায়াময় সবুজ এবং বাতাসে
নুয়েপড়া মাধবীলতার ঝোপ, চৌহদ্দির শেষপ্রান্তে একটা যজ্ঞডুমুর;
হেলে থাকা ডালে পুচ্ছ নাড়িয়ে শিস দেবে একটা পাখি;
পাখিটা অবশ্যই দোয়েল..., তেমন বাড়ি এই শহরে নেই–
পেছন থেকে কেউ বলল, যদিও এই বাড়িটা আরেকজনের!
হ্যাঁ, এটাই আমার অস্থায়ী বাড়ি..., তোমরা এই বাড়িতেই
আমাকে খুঁজতে পারো; নক করো, দরোজা ভেতর থেকে
কেউ খুলে দেবে, অতিথিদের জন্য আসন পাতাই আছে;
বসে অপেক্ষা করতে থাকো... ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে, এরপরও
কারো সাড়া পাবে না, কেউ বলবে না আমি আছি নাকি নেই!
আমাকে খুঁজবে দেয়ালে? না আমার কোনো ছবি নেই, বুকসেলফে
অনেক বইয়ের মধ্যে আমি নেই, একসময় কর্নার-সেলফে
অনেক পদক-সম্মাননা শোভা পেত; কিন্তু সেখানে এখন
সটান দাঁড়িয়ে লালন, বুড়ো একা একা বাজিয়ে চলেছেন একতারা...
আরশিনগর কোথায়?... আমি থাকি আরশিনগরে;
এই বাড়িটা আমার অস্থায়ী আবাস;
তবে আমার আত্মা ঘুমিয়ে থাকে আরশিনগরে...,
তোমরা আরশিনগর চেনো?

ক্লান্ত-শ্রান্ত

জাকির হোসেন চৌধুরী

বেশি হিসাবি হতে গেলে
হিসাব মেলানো দ্যায় হয়
কেবল বাড়ে জীবনের জটিলতা
সেই জটিলতার অঙ্ক থেকে
যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ
কোনো ফলাফল দিতে পারে না
লাভটা তাহলে কার হলো?
বেশি গোছাতে গেলে
গোছানো জিনিস খুঁজে খুঁজে
ক্লান্ত-শ্রান্ত
কেবল বেলা বেড়ে যায়
নদীর জল শুকিয়ে
কঙ্কাল নদীর ভেতরে
মাছেদের ফসিল জেগে থাকে
এতটা গোছাতে গিয়ে
লাভ কার বেশি হলো?
বেহিসাবি দখিনা বাতাস
উড়িয়ে নেয় তোমার চুলের ঘ্রাণ
টিএসসির মোড়ে
দিনগুলো উড়ে উড়ে চলে বাতাসে
বাতাসের সেই বকুলের ঘ্রাণ
আজও জমা বুকের ভেতরে।

ঈদের ছুটিতে

লিলি হক

ফসলের ভরাট ক্ষেতে শস্য খাওয়া
ইঁদুর, মলনের লেপাপোছা উঠোনে
যেমন বেদনা বিধুর। ফলবান বৃক্ষেরা
কেমন তৃষ্ণা মেটাতে ব্যাকুল পথিকের,
কিশোরী চপলার বাড়ন্ত যৌবন
কাঁখের কলসে উপচে পড়ে ফের।
গাঁয়ের মোড়ল আড়চোখে তামাশা
করে, আর সুরমা লাগায় ইতর চোখে!
মেহেদি রাঙানো চুলে বিলি দেয়
চতুর আঙুল, না মানে জাতকুল।
দিন তারিখ ঠিক হয়ে যায়, শুভ
কাজে কেন দেরি, কাচের চুড়ি, প্রিন্টের
শাড়ি, গোটা চার মেহমানদারি।
কুমারী কন্যার বুক ভাঙে, ভাঙে
সোমেশ্বরীর কূল, লুটেরা মোড়ল
তছনছ করে হাসনাহেনা বকুল।
সর্বনাশের ঢেউ পাড় ভাঙে, কাঁচা
হলুদ মন, আশঙ্কায় কাঁপে থরথর,
সারাবাড়ি সুনসান, পড়শির লাগা ঘর।
মেজাজি মানুষটার খেদমতে কেটে যায়
বেলা, বাপ-মার আদরের কুসুম
কেঁদে মরে সারারাত, চোখে নাই ঘুম।
বহুদিন পর গাঁয়ে যাই, ঈদের ছুটিতে
খোঁজ নেই, মা কোথায় কুসুম?
এখনো আসে না যে কোচর ভরা আম,
শাপলা, শালুক নিয়ে। কাঁচা মিঠে আম
কিংবা বেতফল, চালতা, বরই, জামরুল।
সব শূন্যে স্তব্ধ নিঝুম, ভুল, এত্তো
বড়ো ভুল! কেমন করে হলো মা,
কেমন করে হলো? আমাকে
তুমি সত্যি করে বলো। যৌতুক!
অসুস্থ বাপ, এসব কারণেই নাকি
যৌবন ভরা কুসুমকে বলি দিতে হলো।
তবুও প্রত্যাশা, জেগে থাকবে কলসিন্দুর
জেগে থাকবে আগামীর স্বপ্নসুর
জেগে উঠবে মানবতা। সাফল্যের মূল্যায়নে
নারীর ক্ষমতায়নে সমৃদ্ধির পথ ধরে এগিয়ে যাবে
এভাবেই, আমার বাংলাদেশ।

তোমাকে চাই

সাদিয়া সিমরান

সাতজন্মে আমি তোমাকে চাই,
পরজন্মে আমি তোমাকে চাই,
রোদেলা দুপুরে তোমাকে চাই,
বরষণ রাতে আমি তোমাকে চাই।
শত পাওয়ায় তোমাকে চাই,
আমার না পাওয়ার বেদনা নিশিতে তোমাকে চাই।
আমি তোমাকে চাই, তোমাকে চাই,
আমি কিন্তু সত্যি ভালো আছি
তোমাকে চেয়েছি তাই।
আমি শতজন্মে তোমাকে জড়িয়ে রবো
স্বর্ণলতা হবো তোমার।

গুচ্ছগ্রাম: আশ্রয়হীনদের আশ্রয়

রেজুয়ান খান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি 'আশ্রয়ণ প্রকল্পে'র লক্ষ্য গৃহহীনের বাসস্থান নিশ্চিত করা। ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রিত মানুষ শতভাগ সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার ভোগ করছে। খোলা আকাশের নিচে অথবা কারো অনুগ্রহে যারা অতি কষ্টে এতকাল দিন পার করেছে, তাদের এখন সুখের দিন। গৃহহীন, ঠিকানাবিহীন, ছিন্নমূল মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদান গৃহহীনের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ।

সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রকল্প বিবেচনায় ৩১শে মার্চ ২০০৯ একনেক সভায় গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস্ রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট) নামে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। সে সময় থেকে এ পর্যন্ত সারাদেশে বিগত দশ বছরে ৩১ হাজার ৩৫০টি গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের লক্ষাধিক মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গুচ্ছগ্রাম তৈরির মাধ্যমে ২০১৯ সালের মধ্যে সারাদেশে ৫০ হাজার গৃহহীন, ভূমিহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাসজমিতে ঘর নির্মাণ করে তাদের পুনর্বাসন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, নদীভাঙার ফলে গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষেরা নতুন ঘরে এখন উৎসব করছে। জামালপুরের চরযথার্থপুর গুচ্ছগ্রামের লেবুজা, আমেনাদের দিন ফিরেছে। দুজনই বিধবা। দুজনেরই সন্তান আছে। আমেনার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটির ২১ বছর ও তার ছোটো ছেলের বয়স ১৯। মেয়েটি সরকার প্রদত্ত নারীদের বিনা খরচে শিক্ষার সুবিধা পেয়ে নান্দিনা ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে স্থানীয় একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। ২০১৮ সালের মে মাসে মেয়েটির বিয়ে হয় কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানেরই একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আকবরের সাথে। আকবরের বয়স ২৩ বছর। এখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের দিন কাটছে। একসময় তাদের কোনো স্বজন ছিল না। এখন আমেনার বেয়ান হয়েছে। আত্মীয়স্বজন হয়েছে। আমেনার কন্যা সাথীর স্বামী আকবর লেবুজা বেওয়ার একমাত্র পুত্র। আকবরও নান্দিনা ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছে। চরযথার্থপুর গুচ্ছগ্রামে দুপরিবার ঘর পেয়ে তাদের আনন্দের যেন সীমা নেই।

গুচ্ছগ্রাম ও বিআরডিবি'র সহায়তায় ২০১৩ সালে লেবুজার ছেলে আকবর ও আমেনার মেয়ে সাথী ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প কাজের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বিআরডিবি গুচ্ছগ্রামে আশ্রিত পরিবারের যুবক-যুবতীদের মাঝে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে আকবর আর্ট কার্ড, খাম, বক্স তৈরি ও প্রিন্টিং কাজের একটি মেশিন ক্ষুদ্রঋণের টাকা দিয়ে ক্রয় করে। প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং কাজে দিনে দিনে আকবরের ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকে। কোনো কোনো মাসে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয়।

এদিকে সাথী বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্থানীয় কুটিরশিল্প নকশিকাঁথা বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে মাসে ৮ হাজার টাকা বেতনের চাকরি নেয়। চোখের কাছে বড়ো হওয়া ঘরের লক্ষ্মী সাথীকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়ে লেবুজা বেওয়ার খুশির সীমা নেই। নিজের মেয়ের মতো করেই পুত্রবধূর সাথে দিন কাটছে। অথচ সেই ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই আমেনা ও লেবুজারা খোলা আকাশের নিচে ও অন্যের গলগ্রহে ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে বহু কষ্টে দিন পার করেছে। ২০১২ সালের আগ পর্যন্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি ঝিয়ের কাজ এমনকি ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল তাদের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অথবা অন্য কোনো কারণে গৃহহীন ও আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য আশ্রয়ণ, আমার বাড়ি আমার খামার, ঘরে ফেরা এবং গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর নির্মাণ করে সেখানে লক্ষাধিক মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১২ সালের জামালপুর সদরের লক্ষ্মীরচর ইউনিয়নের চরযথার্থপুর গ্রামে ৫০টি গৃহহীন পরিবারের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আট শতাংশ জমির ওপর দুই কক্ষের ঝকঝকে টিনের ঘর পায়। লেবুজা, আমেনাদের পরিবারে এখন আর অভাব নেই। এরকম হাজার হাজার আশ্রিত পরিবার এখন স্বাবলম্বী হচ্ছে গুচ্ছগ্রামে আশ্রয় পেয়ে।

বর্তমান সরকার সারাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার গৃহহারা মানুষ, বিশেষ করে বিধবা নারীদেরও মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে। গুচ্ছগ্রামে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে এবং বিধবাদের নিজের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদান করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন শতভাগ বাস্তবায়িত হচ্ছে গুচ্ছগ্রামগুলোতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ– আমার বাড়ি আমার খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ, পরিবেশ সুরক্ষার মতো প্রকল্পগুলো দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো– দেশের গৃহহীন, ভূমিহীন নিঃস্ব পরিবারকে পুনর্বাসিত করা। এছাড়া পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। মানবসম্পদের উন্নয়ন করাও এ প্রকল্পের আওতাধীন। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)'র মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমশক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারের মধ্যে সামর্থবান যুবক-যুবতীদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করাই হচ্ছে গুচ্ছগ্রামের মূল কাজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঞ্চিত, গরিব ও অসহায় মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করছে। নদী ভাঙনে বাস্তুচ্যুত, দুস্থ এবং ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের খাস জমিতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সরকার হাতে নেয় গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পটি। একজন নদী ভাঙন কবলিত নিঃস্ব মানুষের কাছে এ আশ্রয়টুকু অনেক বড়ো।

লেখক: বার্তা সম্পাদক, ডিএফপি

নিবন্ধ

বাংলাদেশের হরিণ

অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

হরিণ পৃথিবীর সুন্দর প্রাণীগুলোর একটি। হরিণির মায়াবী চোখ কার না দৃষ্টি কাড়ে! সুন্দর ছোট্ট আদুরে হরিণশাবক দেখলে কার না আদর করতে ইচ্ছে করে! আর শাখাপ্রশাখাযুক্ত পুরুষ হরিণের শিং দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না! মোটকথা হরিণ সৃষ্টিকর্তার এক অনন্য সৃষ্টি।

হরিণ গরু-ছাগলের মতো বিভক্ত খুরবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী (Hoofed Mammals)। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, অ্যান্টিলোপদের নিকটাত্মীয় এরা। তবে এদেরকে গরু-মহিষের মতো একই গোত্র বোভিডিতে (Bovidae) অন্তর্ভুক্ত না করে ববং আলাদা গোত্র সারভিডিতে (Cervidae) রাখা হয়েছে। মরুভূমি, তুন্দ্রা, জলাভূমি, পার্বত্য এলাকাসহ পৃথিবীর সবখানেই হরিণ দেখা যায়। পৃথিবীতে হরিণের মোট প্রজাতির সংখ্যা ৬২। এছাড়াও ইঁদুরে হরিণ (Mouse Deer) নামে এক ধরনের ক্ষুদে হরিণজাতীয় প্রাণী রয়েছে– যারা একটি ভিন্ন গোত্র ট্রাগুলিডি (Tragulidae)-এর সদস্য। এই গোত্রের সদস্য সংখ্যা ১০। বাংলাদেশে এক সময় পাঁচ প্রজাতির হরিণ বাস করত যারা সারভিডি গোত্রের সদস্য। বিভিন্ন প্রজাতির হরিণের মধ্যে চিত্রা, মায়া, সম্বর, বারশিঙ্গা, পারা হরিণ ও ছোটো ইঁদুরে হরিণ। সুন্দরবন, নিঝুম দ্বীপ, সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে এদের বেশি দেখা যায়।

চিত্রা হরিণ

এদেশের হরিণের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে চিত্রা হরিণ। এরা চিতাল (Chital) বা স্বর্ণমৃগ নামেও পরিচিত। হরিণের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে চিতালকেই সবচেয়ে সুন্দর বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী বন্যপ্রাণীদের মধ্যে এরা সবচেয়ে সুন্দর বলে বিবেচিত। সচরাচর দৃশ্যমান চিতালের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস (Axis axis)। একসময় এদেশের ব্যাপক এলাকাজুড়ে, বিশেষ করে বনাঞ্চলে এদেরকে যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যেত। প্রাকৃতিকভাবে বর্তমানে সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও এদের দেখা মেলে না। অবশ্য বনবিভাগ কৃত্রিমভাবে নিঝুম দ্বীপে কিছু চিত্রা হরিণ ছেড়েছিল। ইতোমধ্যে ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধির কারণে সেখানে প্রায় পনেরো হাজার হরিণ আছে।

চিতালের দেহের লালচে বা গাঢ় বাদামি লোমের ওপর সাদা সাদা ফোঁটার সমাহার এক অনন্য সৌন্দর্যের সমাহার ঘটিয়েছে। এদের দেহের এই সুন্দর রং একদিকে যেমন এদেরকে শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে আত্মগোপনে সাহায্য করে তেমনি চোরা শিকারিদের লোভ-লালসার কারণও হয়। যাহোক, এদের গলা ধবধবে সাদা। বুক ও দেহের নিচের অংশও সাদাটে। হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত অংশের লোম হালকা সাদা বা ধূসর। কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতায় চিত্রা হরিণ ০.৬-১.০ মিটার ও লম্বায় গড়ে ১.৫ মিটার। মর্দা হরিণ বা হরিণ ৩০-৭৫ কেজি ও মাদি হরিণ বা হরিণি ২৫-৪৫ কেজি হয়। হরিণের অত্যন্ত সুন্দর শিং গজায়। এরা সচরাচর বছরে একবার শিং বদলায়। তবে শিং গজানো ও পড়ে যাওয়ার সময়সীমা অঞ্চল, হরিণের বয়স ও খাদ্যের পুষ্টিমানের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

চিত্রা হরিণ তৃণভোজি। সাধারণত ঘাস, লতাপাতা, গাছের পাতা ও বাঁকল খেয়ে জীবণ ধারণ করে। সুন্দরবনের হরিণগুলো মূলত কেওড়া, বাইন, গেওয়া, গরান, গর্জন এবং কাঁকড়া গাছের চারা, পাতা ও বাকল খেয়ে থাকে। চরে নতুন জেগে ওঠা ঘাসের মধ্যে দূর্বা, নলখাগড়া, হোগলা, মারিয়া ইত্যাদি বেশি পছন্দ করে। সাধারণত সূর্য ওঠার আগে ও ডোবার পর এরা খাবারের সন্ধানে বের হয়। আর সারাটি দিন জঙ্গলে বিশ্রাম করে। চিত্রা হরিণ দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে। দলে সাধারণত ১০-১৫টি হরিণ থাকে, এর মধ্যে ২-৩টি মর্দা হরিণ থাকে। প্রজননের পূর্বে মর্দা হরিণদের শক্তি পরীক্ষা চলে শিংয়ের গুতাগুতির মাধ্যমে। এসময় কোনো কোনো হরিণের শিং খুলেও যেতে পারে। তবে দলের সবচেয়ে বলিষ্ঠ, শক্তিশালী ও দীপ্তমান মর্দা হরিণের হাতেই থাকে দলের কর্তৃত্ব। দলের সব হরিণির ওপর থাকে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। বাকি মর্দাগুলো দলপতির একান্ত অনুগত হিসেবে দলে থাকে। যেহেতু এরা সারাবছরই দলবদ্ধভাবে থাকে তাই এদের মধ্যে প্রজনন (mating) হয় অধিক এবং সারাবছরই বাচ্চা জন্মাতে দেখা যায়। আর তাই এদের প্রজনন ও বাচ্চা দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনো ঋতু নেই। তবে মে থেকে আগস্টের মধ্যেই বেশিরভাগ সদস্য প্রজননের কাজ সাড়ে। চিত্রা হরিণি ৭-৮ মাস গর্ভধারণের পর ফুটফুটে একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। সাধারণত বর্ষার আগে আগে যখন সবুজ ঘাসের সমারোহ ঘটে এবং গাছের চারা, ঘাস ও লতাপাতায় বন ছেয়ে যায় তখন বেশিরভাগ হরিণির বাচ্চা হয়ে থাকে। তবে বর্ষাকালে খাবারের প্রাচুর্য থাকায় এ সময় জন্মানো বাচ্চাগুলো অন্যান্য সময়ে জন্মানো বাচ্চাগুলোর থেকে বেশি তাজা থাকে। নবজাতকের গায়ের রং বাদামি এবং কয়েকমাস পর্যন্ত গায়ে কোনো ফোঁটা দেখা যায় না। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাদা ফোঁটা সৃষ্টি হতে থাকে।

সুন্দরবনের হাড়বাড়িয়ায় একটি বয়স্ক চিত্রা হরিণি

মায়া হরিণ

মায়া হরিণ বা মায়ামৃগ এদেশের একটি অতি পরিচিত ও সচরাচর দৃশ্যমান হরিণ প্রজাতি। এরা

ডুলা হাজরার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কের প্রাকৃতিক পরিবেশে মায়া হরিণি

রুরু হরিণ বা কাকার নামেও পরিচিত। এদের বৈজ্ঞানিক নাম মুনটিয়াকাস মান্টজ্যাক (Muntiacus muntcjac)। সুন্দরবনসহ দেশের সকল পাহাড়ি বনাঞ্চলে এদের দেখা যায়। হরিণ ও হরিণি নির্বিশেষে মায়া হরিণের দেহের রং চকচকে লালচে-বাদামি, বিশেষ করে পিঠ ও লেজের উপরের অংশ। আর দেহের দু' পাশটা হালকা বাদামি। পেট ও লেজের নীচের অংশের রং সাদা। ছোটো বাচ্চার গায়ে সাধারণত সাদা ফোঁটা থাকে। এরা লম্বায় ০.৯ মিটার পর্যন্ত হয়। কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতায় ০.৫০-০.৭৫ মিটার ও ওজনে প্রায় ১৪-২৮ কেজি হতে পারে। এদের লেজ ছোটো ১৭ সেন্টিমিটারের মতো। হরিণের দুই ডালওয়ালা শিং ১৭-২০ সেন্টিমিটারের মতো হতে পারে।

মায়া হরিণ দলবেঁধে চলে না। বেশিরভাগ সময় একাকি ঘোরাফেরা করে। তবে অনেক সময় দু' তিনটির দলেও দেখা যায়। এমনিতে সকাল-সন্ধ্যা ডাকাডাকি করে। তবে ভয় পেলে ঘন ঘন ডাকতে থাকে। অনেকটা কুকুরের ন্যায় ভেউ ভেউ বা ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। এ কারণেই কুকুরে হরিণ বা বার্কিং ডিয়ার নামেও পরিচিত। বাচ্চাগুলো টি টি স্বরে সরু গলায় ডাকে। এরা দৌড়াতে দৌড়াতে থেমে ডাক ছাড়ে, আবার দৌড়ায়। লোক দেখলেই ভয়ে পালায়। দৌড়ুতে বেশ পটু। ঘন বন, ঝোপঝাড়, গাছ, লতা কিছুতেই আটকায় না। দৌড়ানোর সময় এক রকম খটর খটর আওয়াজ হয়। হরিণের চোয়ালে দুটো লম্বা দাঁত থাকে। দাঁত দুটো বাঁকা হয়ে থাকে আর বাইরে থেকে দেখা যায়। এই লম্বা দাঁত দুটোই এদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। কোনো জন্তুকে কাছে পেলে লম্বা দাঁত দিয়েই তাকে ঘায়েল করে।

চিত্রা হরিণের মতো এরাও ভোর ও গোঁধূলিতে তৎপর থাকে। এসময় ঘাস, লতাপাতা ও গাছ থেকে ঝড়ে পড়া পাকা ফল খায়। বনের ধারের বা বনের মাঝের ঘাসবহুল ফাঁকা জায়গা, বনের ছড়া, চা বাগানের সরু মেঠোপথ এদের প্রিয় জায়গা। এরা মাঝে মাঝে নোনা মাটি চেটে থাকে।

অন্যান্য হরিণের মতো এদেরও একই নিয়মে শিং গজায় এবং বছর বছর শিং বদলায়। তবে এদের শিং আকারে খুবই ছোটো। মায়া হরিণ ও হরিণি উভয়েই এক বছর বয়সে প্রজননক্ষম হয়। সাধারণত শীতকালে প্রজনন করে ও বর্ষার শুরুতে বাচ্চা প্রসব করে। গর্ভধারণকাল ৬-৭ মাস। সাধারণত একটি বাচ্চার জন্ম হয়। অনেক সময় দুটি বাচ্চারও জন্ম দিতে পারে। আয়ুষ্কাল ১৫-২০ বছর।

সম্বর

বাংলাদেশের হরিণ প্রজাতিগুলোর মধ্যে সম্বর বা সাম্বার বৃহত্তম। বৈজ্ঞানিক নাম সারভাস ইউনিকালার (Cervus unicolor)। এরা পুরোপুরি বনাঞ্চলের প্রাণী হলেও পাহাড়ি বনাঞ্চলের আবাদি এলাকাই বেশি পছন্দ করে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনেই এরা বসবাস করে।

অন্যান্য হরিণের তুলনায় এদের রয়েছে রুক্ষ লোমশ চামড়া। মর্দা সম্বরের গলা ও ঘাড়ে রয়েছে দীর্ঘ লোমের কেশর। গায়ের রং গাঢ় ধূসর-বাদামি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু হলদে আভাও দেখা যায়। সাধারণত হরিণি ও বাচ্চাগুলোর দেহের রং হরিণের তুলনায় বেশি লালচে হয়। কোনো কোনো হরিণের দেহের রঙে কালচে বা ধূসর ভাবটা বেশি থাকে তাই অনেকে এদেরকে 'কালেশ্বর' বলে থাকেন। আর সাধারণ রঙের হরিণগুলোকে 'ধলেশ্বর' বলে। সম্বর হরিণ উচ্চতায় গড়ে ১.০-১.৬ মিটার, লম্বায় ১.৮-২.১ মিটার ও ওজনে প্রায় ২২৫-৩২০ কেজি হয়। হরিণি কিছুটা ছোটো হয়। শিং ৬০-৯০ সেন্টিমিটার বা তারও বেশি লম্বা হতে পারে। প্রতিটি শিংয়ে ছয়টি ডাল বা শাখা থকে। সাধারণত মে মাসের দিকে শিং গজায়। তখন শিংয়ের ওপর ভেলভেটের মতো নরম চামড়া থাকে।

সম্বর হরিণ পরিবার

নভেম্বরের দিকে শিং পূর্ণতা পায় ও নরম চামড়ার আবরণটি খসে পড়ে এবং হাড়ের তৈরি শাখাপ্রশাখাযুক্ত শিং বেরিয়ে আসে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এরকম ভারী দেহ ও তিন ডালের বড়ো শিং নিয়েও এরা দিব্যি পাহাড়ে পাহাড়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায়। এই শিং প্রতি ১-২ বছর পর পর ঝরে পড়ে।

ঘাস ও গাছের পাতা এদের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া গাছের নরম ডালও বেশ পছন্দ করে। মাঝে মাঝে নোনা মাটি চেটে থাকে। রাত্রিবেলা কাছাকাছি কোনো ক্ষেতে চড়ে বেড়ায়। দিনের বেলা ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। রোদ একদম সহ্য করতে পারে না। গরমের দিনে পানির মধ্যে বসে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। কোনো বিপদের সংকেত পেলে মর্দা সম্বর যখন শিং বিস্তৃত করে উঠে দাঁড়ায় তখন দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। রাত্রিবেলা মর্দা সম্বর যখন তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে তখন সারা জঙ্গলে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে।

সম্বর হরিণ দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে না। প্রজনন ঋতু ছাড়া বাকি সময় হরিণগুলো একাকীই থাকে। প্রজনন ঋতুতে হরিণগুলো নিজেদের কর্তৃত্ব প্রমাণের জন্য মারামারি করে ও বিজয়ী হরিণ একটি নির্দিষ্ট এলাকার সকল হরিণির সঙ্গে প্রজনন করে। কাজেই প্রজনন ঋতুতে একটি হরিণের সঙ্গে ৬-৭টি হরিণির দল দেখা যায়। তবে দলে অনেক সময় বাচ্চা হরিণও থাকতে পারে। সম্বর সাধারণত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রজনন করে। আর প্রজননের পরপরই হরিণগুলো দল ছেড়ে চলে যায় ও আবার একাকী জীবনযাপন শুরু করে। হরিণিগুলো সাধারণত বাচ্চাসহ ছোটো ছোটো দলে থাকে ও বাচ্চাদের লালনপালন একাই করে থকে। হরিণি প্রায় ৮ মাস গর্ভধারণের পর সরাচর একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে অন্যান্য প্রজাতির হরিণির মতো এরাও কোনো একটি নিভৃত স্থান খুঁজে বের করে। কারণ প্রসবের পর কয়েকদিন পর্যন্ত হরিণশাবক প্রায় নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকে। মা বার বার দুধ পান করিয়ে এদেরকে বাঁচিয়ে রাখে ও সপ্তাহখানেকের মধ্যে এরা উঠে দাঁড়ায়। মা ছাড়া আর কেউ বাচ্চার অস্তিত্ব টের পায় না। প্রায় দু' মাস বয়সে বাচ্চাগুলো দৌড়াদৌড়ি করার উপযুক্ত হয়। এরা প্রায় দু' বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে থাকে। এরপর মর্দা বাচ্চাগুলো মা থেকে আলাদা হয়ে একাকী জীবনযাপন শুরু করে। বুনো অবস্থায় এদের আয়ুষ্কাল ৮-১০ বছর হলেও আবদ্ধাবস্থায় প্রায় ১৬ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

বারশিঙ্গা

সম্বর হরিণের নিকটাত্মীয় বারশিঙ্গা আকৃতিতে সম্বরের থেকে কিছুটা ছোটো হলেও বলিষ্ঠ ও আঁটোসাঁটো প্রাণী। এই হরিণের শিং সাধারণত বারোটি শাখাপ্রশাখার সমন্বয়ে গঠিত বলে এরা বারশিঙ্গা নামে পরিচিত। জলার কিনারায় মাথা ডুবিয়ে হোগলা চিবিয়ে খায় বলে এরা জলার হরিণ নামেও পরিচিত। এরা সম্বরের অত্যন্ত নিকটাত্মীয়। বৈজ্ঞানিক নাম সারভাস ডুবাউচেলি (Cervus duvauceli)। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন ও সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলে এরা বাস করে।

মর্দা বারশিঙ্গার কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা ১.৩৫ মিটার ও ওজন ১৭৫-১৮০ কেজি। শিংয়ের গড় দৈর্ঘ্য ০.৭৫ সেমি, তবে ১.০৪ মিটার লম্বা শিংওয়ালা বারশিঙ্গাও রেকর্ড করা হয়েছে। শিংয়ের গড় ঘের ১৩ সেন্টিমিটার। মর্দা বারশিঙ্গার শিংয়ে ১০-১৪টি বা তার থেকেও বেশি চূড়া থাকে, এমনকি ২০টি পর্যন্ত চূড়াও রেকর্ড করা হয়েছে। এদের গায়ের লোম পশমের মতো মনে হয়। শীতের দিনে এদের দেহের রং বাদামি থেকে হলদে-বাদামি হয়। আর গরমের দিনে উপরের ভাগ লালচে-ধূসর হয়। দেহের নিচের অংশ ও পায়ের ভেতরের দিকের রং হালকা ও ফ্যাকাসে। দেহের লেজের নিচের দিকের রঙ সাদা। মর্দা হরিণের ঘাড়ের লোম লম্বা ও গাঢ় রঙের, যা দেখতে কেশরের মতো। বাচ্চা হরিণের গায়ে বুটি বুটি দাগ থাকে।

এরা দলবেঁধে চলাফেরা করতে পছন্দ করে। তবে অনেক সময় একাকী বিচরণ করতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেলেও জঙ্গলের বাইরে চরতেই বেশি ভালোবাসে। এদের প্রধান খাদ্য ঘাস, পাতা ও গাছ থেকে ঝরে পড়া ফল। তাছাড়া হোগলা পাতা খেতেও বেশ পছন্দ করে। এদেশে যখন পাওয়া যেত তখন জলাভূমির আশপাশে ১০-১২টির দলে সকাল বিকেল ঘাস খেতে দেখা যেত। এরা সকাল বিকেল দু' বেলা খাবার খেতে বের হয় ও দিনের বাকি সময় শুয়ে-বসে কাটায়। এদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর।

সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল এদের প্রজনন ঋতু। আর আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যেই বেশিরভাগ হরিণি বাচ্চা প্রসব করে। হরিণি ২৪০-২৫০ দিন গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। আবদ্ধাবস্থায় ২৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

পারা হরিণ

পারা হরিণ বা হগ ডিয়ার এদেশে নাত্রিনি হরিণ, লুভ হরিণ ও শুকর হরিণ নামেও পরিচিত। সুন্দরবন ও সিলেটের কিছু কিছু এলাকায় এদের দেখা যায়।

এরা চিত্রা হরিণের চেয়ে আকারে কিছুটা ছোটো। কাঁধ পর্যন্ত হরিণির উচ্চতা ০.৬ মিটার ও ওজন প্রায় ৩০ কেজি। হরিণগুলো লম্বায় প্রায় ১.২৫ মিটার, যার মধ্যে লেজ ২০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা প্রায় ০.৭ মিটার ও ওজন প্রায় ৫০ কেজি। অ্যান্টলার বা শিংয়ের গড় দৈর্ঘ্য ৩০ সেমি। শিংয়ে তিনটি শাখা ও তা উপরের দিকে ওঠানো থাকে। এরা বছর বছর শিং বদলায়। দেহের রঙ ময়লা বাদামি ও তাতে ধূসর বা সাদা ফোঁটা থাকতে পারে। কোনো কোনো হরিণের শিরদাড়ার দু' পাশে দুই লাইনে ছোটো ছোটো সাদা ফোঁটার সমাহার দেখা যায়। দেহের নিচের অংশ হালকা রঙের। কানের ভিতরের ও লেজের নিচের অংশ এবং অগ্রভাগ সাদা। হরিণের দেহের রং হরিণির থেকে গাঢ়।

কলকাতার আলীপুর চিড়িয়াখানায় একটি বারোসিঙ্গা হরিণি

পারা হরিণ সাধারণত একাকী চলাফেরা করে। তবে কখনো কখনো দলবদ্ধভাবেও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। দিনের বেলা ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে ও অন্ধকারের

ভেলভেটযুক্ত শিংওয়ালা পুরুষ পারা হরিণ

সময় খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। বিভিন্ন ধরনের ঘাস, গাছের পাতা ও নদীর পাড়ের লতাপাতা খেতে পছন্দ করে। ভয় পেলে শিস দেওয়ার মতো এক ধরনের শব্দ করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায়।

সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রজনন করে। পারা হরিণি ২২০-২৪০ দিন গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। জন্মের সময় বাচ্চার দেহে ফোঁটা থাকে, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা মিলিয়ে যায়। প্রায় এক বছর বয়সে বাচ্চাগুলো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ছোটো ইঁদুরে হরিণ (Lesser Mouse Deer)

আমাদের দেশের মানুষ, বিশেষত মুসলিম জনগণ ইঁদুরে হরিণকে খুর যুক্ত খরগোশ বলে মনে করে। আর তাই এদেরকে খুরওয়ালা খরগোশ নামে ডাকা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরা কোনো খরগোশ নয়, বরং এক প্রজাতির ক্ষুদ্র হরিণ জাতীয় প্রাণী। এদেশে এরা ফইট্টা নামেও পরিচিত। তাছাড়া যশোর এলাকায় এদেরকে খয়রা বলেও ডাকা হয়। পৃথিবীতে ১০ প্রজাতির ইঁদুরে হরিণ থাকলেও এদের শুধু একটি প্রজাতি এদেশে পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন। এরা ট্র্যাগুলিডি পরিবারের সদস্য। এদেশে যে প্রজাতির অস্তিত্ব আছে বলে অনেকে মনে করেন সেটি হলো ক্ষুদে মালয় চেভ্রোটেইন (Lesser Malay Chevrotain) বা ক্ষুদে ইঁদুরে হরিণ। চেভ্রোটেইন একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ 'Little goat' বা 'ছোটো ছাগল'। বৈজ্ঞানিক নাম ট্র্যাগুলাস কানছিল (Tragulus kanchil)। খুলনা, বাগেরহাট, যশোর এমনকি গাজীপুরে অনেক লোকের মুখে আমি এদের কথা শুনেছি। তাদের অনেকেই এদেরকে নিজ চোখে দেখেছেন বা এদের মাংস খেয়েছেন বলেও দাবি করেছেন।

পূর্ণবয়স্ক ইঁদুরে হরিণের কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা মাত্র ২৫ সেন্টিমিটার, লম্বায় ৪৫ সেন্টিমিটার ও ওজনে মাত্র ১.৭৫-২.০০ কেজি হয়। এর চেয়ে ছোটো বিভক্ত খুরবিশিষ্ট রোমন্থক প্রাণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এদের দেহ ছোটো হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দেহের তুলনায় পা চারটি লম্বা ও চিকন। হরিণ ও হরিণি কারোরই শিং নেই। তবে মায়া হরিণের মতো মর্দা ইঁদুরে হরিণের চোয়ালে দুটো লম্বা দাঁত থাকে। দাঁত দুটো বাঁকা হয়ে থাকে আর বাইরে থেকে দেখা যায়। এই লম্বা দাঁত দুটোই এদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। এদের দেহের উপর ও দুপাশের রং গাঢ় বাদামি। তবে কোনো কোনোটার রং হালকা বাদামিও হতে পারে। তাছাড়া দেহের রঙে একটা কালচে আভা থাকে। দেহে অনেক সময় হলদে ফোঁটা থাকতে পারে। পেট ও দেহের নিচের অংশের রং হালকা বা বেলে ধূসর। এদের গলায় তিনটি স্পষ্ট সাদা দাগ রয়েছে।

প্রজনন ঋতু ছাড়া সাধারণত একাকী চলাফেরা করে। এরা বেশ শান্ত, লাজুক ও ভিতু প্রাণী। সাধারণত ঘন ঝোপঝাড় বা পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। রাতে খাবারের সন্ধানে বের হয়। ঘাস, পাতা ও গাছ থেকে ঝরে পড়া পাকা ফল খেতে পছন্দ করে। প্রায় পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর ক্ষুদে ইঁদুরে হরিণি একটি মাত্র শাবকের জন্ম দেয়। বাচ্চারা তিন মাস বয়সে মায়ের দুধ ছাড়ে ও ৫-৭ মাসে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

আমাদের অরণ্যের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণীগুলোর মধ্যে হরিণ অন্যতম।

মালয়েশিয়ার মেলাকা চিড়িয়াখানায় তিনটি ছোটো ইঁদুরে হরিণ

প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষার্থে এবং এ প্রজাতির আরো বংশবৃদ্ধিতে বর্তমান সরকার নানা ধরনের নীতিমালা তৈরি করেছে। যা খুবই সময়োপযোগী। যার ফলে সারা দেশের হরিণ প্রজাতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং এদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লেখক: বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপক, বন্যপ্রাণী প্রজনন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, গাইনিকোলজি অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিভাগ, বশেমুরকৃবি, গাজীপুর

নিবন্ধ

উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ডাল উৎপাদন

ড. এম. জি. নিয়োগী

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের কৃষি জমিতে লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে জলাবদ্ধতা। বাড়ছে তাপমাত্রা, খরা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টিপাত। এই সমস্ত কারণে উপকূলের কৃষকরা শুকনো মৌসুমে চাষাবাদ করে কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতে পারছে না। ফলে উপকূলের বেশিরভাগ কৃষক শুকনো মৌসুমে চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। সারা বছর শুধু বৃষ্টির মৌসুমে একটি ফসল আমন ধান করেই কৃষকদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

শুষ্ক মৌসুমে এই সমস্ত পতিত জমিতে লাভজনক ফসল ফলানোর লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। এই কার্যক্রমের আওতায় বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ডাল ও গম ফসলের জাত উদ্ভাবন করছেন, যা উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষক পরিবারে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান CSIRO সরাসরি সম্পৃক্ত। অস্ট্রেলিয়ার ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research) এবং বাংলাদেশের KGF (Krishi Gobeshona Foundation) এই প্রকল্পে অর্থ সহায়তা করছে।

প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা এবং সাতক্ষীরা উপকূল অঞ্চলে স্থানীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব জমিতে এবং কৃষকের মাঠে সরাসরি কৃষকের অংশগ্রহণে মুগ, মশুর, মটর, খেসারি ও কাউপি বা ফেলন ডালের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ডাল ফসলের জাত চিহ্নিত করা। সেই সাথে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, যাতে উপকূল অঞ্চলের কৃষক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে তাদের পতিত জমিতে লাভজনক ফসল উৎপাদন করতে পারে এবং পরিবারের পুষ্টির নিশ্চয়তা করতে পারে।

বর্তমানে শুধু পটুয়াখালী জেলায় প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে মুগডাল চাষ হচ্ছে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আমন ধান কাটার পরে একই জমিতে কৃষক ২/১টি চাষ দিয়ে মুগডালের বীজ যেনতেনভাবে ছিটিয়ে দিচ্ছে। এতে করে বীজ সমানভাবে গজাচ্ছে না। প্রচুর আগাছা হচ্ছে। লাইনে বীজ না লাগানোর কারণে কৃষক আগাছা দমন করতে পারছে না। আবার আগাছার কারণে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেশি হচ্ছে। ফলে কৃষক অনেক কম ফলন পাচ্ছে। সে কারণে কৃষক আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারছে না।

কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য, ব্যবহার উপযোগী এবং সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প বারি সিডার মেশিন দিয়ে মুগডাল চাষাবাদের উপর গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে মুগডাল চাষাবাদের জন্য ১ বিঘা জমি তৈরি করতে ৩-৪ দিন সময় লাগে এবং এক থেকে দুই হাজার টাকা খরচ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সিডার মেশিন দিয়ে অনায়াসে মাত্র ১ ঘণ্টায় ১ বিঘা জমিতে একই সাথে জমিচাষ, লাইনে বীজবপন এবং সাথে সাথে বীজ ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। এতে খরচ হচ্ছে মাত্র ৪০০-৫০০ টাকা।

লাইনে বীজ বোনার কারণে আগাছা পরিষ্কার করতে সুবিধা হচ্ছে। মেশিনের সাহায্যে বীজ সমভাবে মাটির নিচে বপন হওয়ার কারণে বীজ গজানোর হার অনেক বেশি হচ্ছে এবং একই সাথে সব বীজ গজাচ্ছে এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পেয়ে স্বাস্থ্যবান মুগ ফসল বেড়ে উঠছে। কৃষক ও কৃষিবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণমূলক এই গবেষণায় কৃষক জানিয়েছেন, শুধু সিডার মেশিন দিয়ে মুগডাল চাষাবাদ করলে দ্বিগুণেরও বেশি ফলন ঘরে আসে।

প্রকল্পের আওতায় মুগ ফসলের বিভিন্ন পোকামাকড় দমনের ওপর গবেষণা হচ্ছে। দেখা গেছে, মুগ গাছে ফুল ধরা শুরু হলে থ্রিপস পোকার আক্রমণ হয়। এছাড়া ফুল ও ফল ছিদ্রকারী পোকামাকড় গাছের ফুল ও ফল নষ্ট করে দেয়। পরিবেশ সম্মত উপায়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সমস্ত পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে।

ড. মাহবুব জানান, থ্রিপস পোকা নীল ও সাদা রঙের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাই, নীল আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে এ ধরনের পোকা দমনে সফলতা পাওয়া যাচ্ছে। ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে সেক্সফেরোমন ফাঁদ কার্যকর ভুমিকা রাখছে। হয়ত ভবিষ্যতে বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করেই কৃষকরা পরিবেশসম্মত জৈব বালাইনাশক এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুগ ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করতে পারবে।

মুগ ফসলের আগাছা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর গবেষণা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী একটি সহজ ও কম ব্যয় সাপেক্ষ কার্যকর আগাছা দমন পদ্ধতি কৃষকদের দিতে সক্ষম হবে বলে সংশ্লিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

এই প্রকল্পের আওতায় মুগ ফসল চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাইনে বীজ বপন এবং প্রতি বর্গমিটারে ৩৫টি গাছ থাকলে ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে বলে গবেষকরা মনে করছেন। এছাড়া উপকূল অঞ্চলে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত মুগডালের বীজ বপনে বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে বলে গবেষণায় প্রতীয়মান হচ্ছে।

এই গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় আর্থসামাজিক তথ্য-উপাত্তে দেখা যায় মুগডাল চাষাবাদে পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই সরাসরি জড়িত। পুরুষ সদস্যরা জমি চাষ ও নিড়ানি কাজে জড়িত থাকলেও নারীরা মুগডালের ছেই তোলা থেকে শুরু করে ছেই রোদে শুকানো, মাড়াই করা, পরিষ্কার করা, মুগকালাই রোদে দেওয়া, ঘরে সংরক্ষণসহ সব কাজ করে।

এখন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ধান-গম ভাঙানোর মতো মুগডাল ভাঙানোর মেশিন নাই। সে কারণে মুগডাল চাষীরা কম মূল্যে মুগকালাই ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। যেহেতু গ্রামে ডাল ভাঙানোর মেশিন নেই, সেহেতু পরিবারে ডাল খাওয়ার পরিমাণও অনেক কম। মুগডাল রান্না করে খাওয়ার জন্য শুকনো পরিষ্কার মুগকালাই বাড়ির নারীরা প্রথমে কড়াইতে নিয়ে আগুনে ভেঁজে নেয়। এরপর পাটা-পুতা বা জাঁতাতে ডাল ভেঙে কুলায় পরিষ্কার করে রান্নার উপযোগী করে নিতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ। এসব কারণে কৃষক ডাল উৎপাদন করলেও পরিবারে ডাল খাওয়ার পরিমাণ অনেক কম। এই সমস্যা উত্তরণে প্রকল্প থেকে গ্রামে ডাল ভাঙানের ২/৩টি ছোটো মিল স্থাপন করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, যে মিনি-মিল ACIAR পূর্বের প্রকল্পে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ধরনের মিনি-মিল গ্রামে স্থাপন করলে কৃষক ডাল উৎপাদনের পাশাপাশি ডালের সঠিক বাজার মূল্য পাবে এবং পরিবারে ডাল খাওয়ার পরিমাণ বাড়বে।

আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রকল্পের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র কৃষক পরিবারের স্বার্থে বাংলাদেশ সরকার তাদের নিজস্ব কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে সম্প্রসারণ করে গরিব কৃষক পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এবং তাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখবে। এক্ষেত্রে ACIAR এবং KGF তাদের কারিগরি সহায়তার হাত বাড়াতে পারে।

লেখক: ডেপুটি প্রজেক্ট লিডার, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া

নিবন্ধ

১৪ই জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস

সানজিদা আহমেদ

অগণিত মুমূর্ষু রোগীকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে যারা জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন, তাদের দানের মূল্যায়ন, স্বীকৃতি ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশ্বজুড়ে ১৪ই জুন 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবস' পালন করা হয়। এ দিবসটি পালনের আরো উদ্দেশ্য দেশের জনগণকে প্রাণঘাতী রক্তবাহিত রোগ এইডস, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সিসহ অন্যান্য রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য স্বেচ্ছা রক্তদান ও রক্তের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। যারা স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদান করে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন তাদেরসহ সাধারণ জনগণকে রক্তদানে উৎসাহিত করাই এ দিবসের উদ্দেশ্য।

১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস পালন এবং ২০০০ সালে 'নিরাপদ রক্ত'-এ থিম নিয়ে পালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে প্রথম পালিত হয়েছিল বিশ্ব রক্তদান দিবস। ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনের পর থেকে প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (ডাব্লিউএইচও) এ দিবস পালনের তাগিদ দিয়ে আসছে। রক্তের গ্রুপের আবিষ্কারক কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার জন্মদিন ১৪ই জুন ১৮৬৮। তাঁর স্মরণে ২০০৪ সাল থেকে এ দিবসকে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিবছর ১০৭ কোটি ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এরমধ্যে ৩১ শতাংশ স্বেচ্ছা রক্তদাতা আর ৫৯ শতাংশ আত্মীয় রক্তদাতা। বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে শতভাগ স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উন্নত বিশ্বে রক্তদানের হার প্রতি হাজারে ৪০ জন আর উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি হাজরে ৪ জনেরও কম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের জনগোষ্ঠীর ২ শতাংশ লোক বছরে একবার রক্তদান করলে আমাদের দেশে রক্তের অভাব থাকবে না। তবে ২০২০ সালে বাংলাদেশে চাহিদার শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় ও বিনামূল্যে রক্তদানকারী আড়ালে থাকা সেসব মানুষের উদ্দেশ্যে, এসব অজানা বীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ১৪ই জুনের বিশ্ব রক্তদান দিবস।

রক্ত সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তথ্য জানতে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা পেতে কল করুন স্বাস্থ্য বাতায়নের ১৬২৬৩ নম্বরে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

দস্যু মুক্ত সুন্দরবন রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা

বিনয় দত্ত

আমাদের সুন্দরবন, আমাদের ঐতিহ্য। এই সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই স্বীকৃতির পর আমাদের হয়ত সুন্দরবনের প্রতি আরো অনেক বেশি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল, যেন সুন্দরবন তার আকার, বৈচিত্র্য ধারণ করে থাকতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিকল্পনা, বিভিন্ন বড়ো বড়ো জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনে হানা দিয়ে এর ক্ষতি করে। এরমধ্যে আবার রয়েছে বনদস্যু বা জলদস্যুদের উৎপাত।

সুন্দরবন জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ১লা নভেম্বর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুন্দরবনকে আনুষ্ঠানিকভাবে দস্যু মুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'এখন থেকে সুন্দরবন দস্যু মুক্ত। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দস্যুরা আত্মসমর্পণ করেছে।'

মূলত সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি– যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাজুড়ে বিস্তৃত।

সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটারজুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ রয়েছে ভারতের মধ্যে।

মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে নদী-খাল ঘিরেই একসময় সুন্দরবনে গড়ে উঠেছিল বিশাল জেলে সম্প্রদায়। মাছের এই বিশাল বাজারের কারণে এসব এলাকায় একদিকে যেমন নতুন নতুন জেলে এই পেশায় আসে অন্যদিকে এই অঞ্চলে জেলের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য একশ্রেণির দস্যু নিজেদের আস্তানা গড়ে তোলে। এদের কাজ হলো– সুন্দরবনে মাছ ধরতে যাওয়া বিভিন্ন ট্রলার জিম্মি করা এবং ট্রলারের জেলেদের জিম্মি করে টাকা আদায় করা। দস্যুরা জেলে ও বনজীবীদের কাছ থেকে নিয়মিত মোটা অঙ্কের চাঁদা না পেলেই অপহরণ করত, কখনো টাকা না পেয়ে মারধর করত। একপর্যায়ে জেলেরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ঋণ করে টাকা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের ছাড়িয়ে আনত। এসব দস্যুদের মধ্যে ছোটো-বড়ো বিভিন্ন দল থাকলেও কখনো কখনো নিজেদের কোন্দলের কারণে একটি দল ভেঙে দুটি দস্যু দল গড়ে ওঠে।

এসব দস্যু দলের মধ্যে ছিল– মাস্টার বাহিনী, ইলিয়াস বাহিনী, মোতালেব বাহিনী, মজনু বাহিনী, খোকাবাবু বাহিনী, জনাব বাহিনী, আলিফ বাহিনী, আলম বাহিনী, দাদাভাই বাহিনী, ছোটোভাই বাহিনী, আল আমিন বাহিনী, মজিদ বাহিনী, সাহেব আলী বাহিনী, জাহাঙ্গীর বাহিনী, নোয়া বাহিনী, ছোটো জাহাঙ্গীর বাহিনী, ছোটো রাজু বাহিনী, শান্ত বাহিনী, সুমন বাহিনী, ছোটো সুমন বাহিনী, সাত্তার বাহিনী, জুলফু বাহিনী, শিষ্য বাহিনী, কাশেম বাহিনী, গামা বাহিনী, সাগর বাহিনী, মুকুল-সিদ্দিক বাহিনী, বড়ো ভাই বাহিনী, ভাই ভাই বাহিনী, শামসু বাহিনী, মোস্তাক বাহিনী, মানজু বাহিনী ছাড়াও বেশকিছু ছোটো ছোটো দস্যু দল।

সুন্দরবনের জলদস্যুদের সাথে জেলেদের এই টিকে থাকার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। তবে এই চিত্রের খানিকটা পরিবর্তন আসে ২০০৯ সালের পরে। এবার সেই গল্পটা বলব। এই গল্পের সাথে উঠে আসবে এমন এক সাহসী সাংবাদিকের কথা, যার জন্য আজকের সুন্দরবন দস্যু মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাংবাদিকের নাম মোহসীন-উল হাকিম।

২০০৯ সালের ২৫শে মে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এক ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'আইলা'। এর ফলে পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আইলার প্রভাবে নিঝুম দ্বীপ এলাকার সকল পুকুরের পানিও লবণাক্ত হয়ে পড়ে। খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৭১১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিধ্বস্ত হয়। ফলে খুলনার দাকোপ ও কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন লোনা পানিতে তলিয়ে যায়। ৭৬ কিলোমিটার বাঁধ পুরোপুরি এবং ৩৬২ কিলোমিটার বাঁধ আংশিকভাবে ধসে পড়ে।

আইলার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবন এলাকা। তার দুই বছর আগে 'সিডর' সুন্দরবনের ওপর ব্যাপক আঘাত করেছিল। সেই ক্ষতির পরিমাণও বিশাল।

আইলার সময় জেলেরা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় বাগেরহাটের গাবুরায় আইলা পরবর্তী পরিস্থিতির প্রতিবেদন করতে যাওয়া একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক মোহসীন-উল হাকিমের কাছে সবাই আকুতি জানায়, ভাই আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারব কিন্তু দস্যুদের তো ঠেকাতে পারব না। আমাদের বাঁচান। পারলে দস্যুদের ঠেকাতে কিছু করুন।

মোহসীন বুঝতে পারেন, সুন্দরবনকেন্দ্রিক জলদস্যুদের কাছে এই অঞ্চলের মানুষ কতটা অসহায়। কতটা আতঙ্কে থাকেন ওই জনপদের মানুষ। কতটা অনিরাপদ তাদের জীবনযাপন, চালচলন,

গতিপ্রকৃতি। তিনি বার বার সেই অসহায় মানুষগুলোর চেহারা মনে করেছেন, তাদের অসহায়ত্বের তীব্রতা অনুভব করেছেন। তিনি তখন মিশুক মুনীরের সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন। মিশুক মুনীর মোহসীনকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। শুরু হয় মোহসীনের নতুন পথচলা।

সুন্দরবনের জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ

তখনো পর্যন্ত মোহসীন জানেন না, কীভাবে আগাতে হবে? কার সাথে কথা বলতে হবে? আদৌ দস্যুরা তাকে সহযোগিতা করবে কিনা? এসব না জেনেই যাত্রা শুরু করেন। যোগাযোগ শুরু করলেন দস্যুদের সাথে। সর্বপ্রথম তিনি যোগাযোগ করেন মোতালেব বাহিনীর সাথে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। দস্যুবৃত্তির কুফল সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রথমে রাজি হলেও মোতালেব পরে পিছিয়ে যান। এর কয়েকদিন পর র‍্যাবের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু আশা ছাড়েননি মোহসীন। একের পর এক বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরতে থাকেন ওই নিপীড়িত মানুষের কথা।

সুন্দরবনের দস্যুদের সাথে যোগাযোগ করতে করতে মোহসীন প্রায় সুন্দরবনের সবকিছু চিনে ফেলেন। কখনো একরাত থেকে ফিরে এসেছেন। কখনো একসপ্তাহ, দশদিন, কখনো আবার টানা একপক্ষ পড়ে থাকতে হয়েছে সুন্দরবনে। তার পরিবারের প্রচণ্ড প্রয়োজনেও তিনি পেশাদারিত্বের কাজে সুন্দরবনে ছিলেন।

এই যোগাযোগের ধারা অব্যাহত রাখতে রাখতে অবশেষে ২০১৬ সালের ৩১শে মে বিনা যুদ্ধে দাপুটে মাস্টার বাহিনী প্রথম আত্মসমর্পণ করে। ৫১টি আগ্নেয়াস্ত্র, প্রায় পাঁচ হাজার রাউন্ড গুলি ও তাদের ব্যবহারের সিক্স সিলিন্ডারের ট্রলার নিয়ে ১৩ সদস্যের এই দলটি র‍্যাবের কাছে সব জমা দেয়। বাংলাদেশে এটি প্রথম ঘটনা, সুন্দরবনকেন্দ্রিক কোনো বড়ো দস্যু বাহিনী বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে সকল মহলে। দেশ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সকল গণমাধ্যমে এই সংবাদটি বেশ গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয়।

জার্মানিতে রপ্তানি হচ্ছে পাট পাতার চা

পাট পাতা থেকে তৈরি চা এখন রপ্তানি হচ্ছে জার্মানিতে। বাংলাদেশে কিছুদিন আগে এই চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। জানা গেছে, ফুল আসার আগেই পাট গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে তা রোদে শুকিয়ে গুড়া করতে হয়। এরপর এই পাতা পানিতে জাল দিলেই হয়ে যায় চা। এরপর মধু বা চিনি মিশালেই হয়ে যায় মজাদার চা। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট পাতা থেকে এই অর্গানিক চা বা পানীয় উৎপাদন শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকায় গুয়ার্ছি অ্যাকুয়া অ্যাগ্রোটেক নামের একটি প্রতিষ্ঠান পাটের পাতা দিয়ে তৈরি চা জার্মানিতে রপ্তানি শুরু করে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব নেয় সরকার। বর্তমানে এ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে জার্মানির একটি প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে ৮-১০ টন পাট পাতার চা জার্মানিতে রপ্তানি করা হয়েছে। পাট পাতার চা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম উৎপাদন হচ্ছে।

পাট থেকে শাড়ি। পোশাক, ব্যাগসহ নানাবিধ পণ্য তৈরির পাশাপাশি চা শিল্পে যোগ হচ্ছে পাটের পাতা থেকে চা। এতে পাট ও চা শিল্প সমৃদ্ধ হবে। পাটের সোনালি দিন ফিরিয়ে আনতে পাটকে নানাভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন উদ্ভাবন এই সবুজ চা। ফলে সোনালি আঁশের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

প্রতিবেদন: কামরুল হাসান

বাকি দস্যু বাহিনীরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে, মাস্টার বাহিনীর সবাই র‍্যাবের হাতে মারা পড়বে। যখন মাস্টার বাহিনীর একটি লোকও মারা যায়নি বরং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে– তখন এই বিষয়টা জেনে বাকি দস্যুবাহিনীগুলো যোগাযোগ শুরু করে। তারা নিজেদের অন্ধকার জীবন ফেলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায়। মোট ৩২টি দস্যু বাহিনীর মধ্যে সিংহভাগ দস্যু বাহিনীই মোহসীনের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে। এখন সুন্দরবন দস্যু মুক্ত। এই বিশাল অর্জনের জন্য মোহসীনকে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়েছে। দস্যুদের সাথে যোগাযোগ রাখতে মোট ১৩৭ বার মোহসীনকে সুন্দরবনে যেতে হয়েছে।

যে সুন্দরবনে গড়ে প্রায় ১ লাখ দেশি-বিদেশি পর্যটক প্রতিবছর ঘুরতে আসেন, যে সুন্দরবন ২৪ ঘণ্টায় ছয় বার রূপ পালটায়, যে সুন্দরবন বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের খনি, যে সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে সেই সুন্দরবন এখন দস্যু মুক্ত।

আমরা প্রতিদিন কতরকম সংবাদ পড়ি অথচ এই সংবাদের পিছনে কত নিরলস শ্রম, মেধা লুকিয়ে আছে তা আমাদের অজানা। সুন্দরবনকে দস্যু মুক্ত করার পিছনে মোহসীন-উল হাকিম যে নিরলস শ্রম দিয়েছেন, তারই কল্যাণে তিনি সুন্দরবনের এলাকাবাসীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন– এইটাই তার বড়ো প্রাপ্তি।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

বজ্রপাত

গবেষণা ও সচেতনতা প্রয়োজন

ড. ফোরকান উদ্দিন আহমদ

বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করছেন গবেষকরা। সম্প্রতি বাংলাদেশসহ পৃথিবীজুড়ে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে। এ অস্বাভাবিকতার কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কালো মেঘ বেড়ে যাওয়া। কালো মেঘ সৃষ্টির পেছনে বাতাসে নাইট্রোজেন ও সালফারের পরিমাণ বাড়াকেই দায়ী করছেন বিজ্ঞানীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সামান্য বৃষ্টিপাত বা ঝড়ো বাতাসেও ঘটছে বজ্রপাত। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আবহাওয়া সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বজ্রপাত! দুর্যোগ তথ্য বিশ্লেষণে জানা গেছে, বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মৃত্যুর দেশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বুয়েট, দুর্যোগ ফোরাম, গণমাধ্যমের তথ্য ও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসাব মতে, গত ৬ বছরে সারা দেশে বজ্রপাতে সাড়ে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। তাই বজ্রপাত নিয়ে এখন গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

বজ্রপাতের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে– দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে এখন মুঠোফোন আছে। অধিকাংশ এলাকায় মুঠোফোন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ার রয়েছে। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। সন্ধ্যার পর মানুষের ঘরের বাইরে অবস্থান বাড়ছে। বেশিরভাগ বজ্রপাতই হয় সন্ধ্যায়। নদীর নাব্যতা বিনষ্ট, জলাভূমি ভরাট, বন-জঙ্গল ধ্বংস হওয়ায় দেশের তাপমাত্রা এক থেকে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। বিশেষ করে বর্ষা আসার আগের মে মাসে তাপমাত্রা বেশি বাড়ে। এতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসা আর্দ্রবায়ু আর উত্তরে হিমালয় থেকে আসা শুষ্ক বায়ু মিলে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলেন, আবহাওয়ার অস্বাভাবিক অবস্থা বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা সৃষ্টির কারণে বজ্রপাতের ঝুঁকি বেড়েছে। তারা বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের মতোই ভয়ংকর হতে পারে বজ্রপাত। ঘূর্ণিঝড়ে একই সময় একই জায়গায় অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। আর বজ্রপাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ক্ষতির শিকার হয়। হাওর অঞ্চলে আর্দ্রতা বেশি হওয়ায় সেখানে বজ্রপাত বেশির একটি কারণ হতে পারে।

বজ্রপাতে করণীয় পদক্ষেপগুলো হলো– মেঘের গর্জন বা বিদ্যুৎ চমকালে পূর্ব থেকেই বা সাথে সাথে পাকাবাড়ির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ঘন ঘন বজ্রপাত হতে থাকলে কোনো অবস্থাতেই খোলা বা উঁচু জায়গায় না থাকাই ভালো। এ অবস্থায় সবচেয়ে ভালো হয়, যদি কোনো দালানের নিচে আশ্রয় নিতে পারেন। উঁচু গাছপালা ও বিদ্যুতের লাইন থেকে দূরে থাকতে হবে। উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের খুঁটিতে বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকে। খোলা জায়গায় কোনো গাছ থাকলে তা থেকে অন্তত ৪ মিটার দূরে থাকতে হবে। এছাড়া ফাঁকা জায়গায় কোনো যাত্রী ছাউনি, নদী, বিল, মাঠঘাট বা বড়ো গাছ ইত্যাদিতে বজ্রপাত হওয়ার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি থাকে। ঘরে থাকলে বজ্রপাতের সময় জানলা থেকে দূরে থাকতে হবে। জানলা বন্ধ রাখতে হবে। ধাতব বস্তু এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকি ল্যান্ড লাইন টেলিফোনও স্পর্শ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সব যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা ভালো। বজ্রপাতের সময় রাস্তায় গাড়িতে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরার চেষ্টা করতে হবে। প্রচণ্ড বজ্রপাত ও বৃষ্টি হলে গাড়ি কোনো বারান্দা বা পাকা ছাউনির নিচে রাখতে হবে। এ সময় গাড়ির কাচে হাত দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। বজ্রপাতের সময় চামড়ার ভেজা জুতা বা খালি পায়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক। যদি একান্ত বেরোতেই হয় তাহলে পা ঢাকা জুতা পরে বের হতে হবে। রাবারের গামবুট এক্ষেত্রে সব থেকে ভালো কাজ করবে। খোলা জায়গায় বা ফসলের মাঠে কাজ করা অবস্থায় আশ্রয়ের জায়গা না থাকলে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়তে হবে। কোনো অবস্থাতেই মাটিতে শোয়া যাবে না। জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। নৌকায় থাকলে ছইয়ের নিচে থাকতে হবে।

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ২০টি জরুরি নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে– বজ্রপাতের ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ না করা, প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন, ঝড়-বৃষ্টির সময় খোলাস্থানে অনেকে মিলে একত্রে অবস্থান না করা, সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে চলে যাওয়া, খোলা জায়গায় কোনো বড়ো গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়া, বৈদ্যুতিক তারের নিচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা এবং যন্ত্রপাতির বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্ন রাখা। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করা এবং যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেওয়া উচিত। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

বজ্রপাত সম্পর্কে সচেতন হলে এ দুর্যোগ থেকে অনেকাংশেই রক্ষা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে গবেষণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। বিশেষ করে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জনসাধারণকে সচেতন ও সজাগ করে তোলা প্রয়োজন যাতে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা এড়ানো যায়। বজ্রপাত নিয়ে গবেষণার বিষয়টিকে সরকারের পক্ষ থেকে আরো গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

অস্বাভাবিক ক্ষরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো বজ্রপাত বৃদ্ধির জন্যও ভূমণ্ডলের উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রবণতাকে দায়ী করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলেই বজ্রপাত ও এতে মৃত্যুর হার বেশি। গ্রামে-গঞ্জে আজকাল তাল, নারিকেল, সুপারি, বট প্রভৃতির মতো বড়ো বড়ো গাছের অভাব, বজ্র নিরোধক ব্যবস্থা না থাকা, কৃষি যন্ত্রপাতিতে ধাতব যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও বজ্রপাতের হার বাড়ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বে বজ্রপাতজনিত মৃত্যু এক-চতুর্থাংশই ঘটে বাংলাদেশে। এখানে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি থাকে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বজ্রপাত সবচেয়ে বেশি হয়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় গড়ে প্রায় ৪০টি বজ্রপাত হয়ে থাকে।

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই। সতর্ক হলে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো যেতে পারে। একসময় দেশের বেশিরভাগ গ্রামে বড়ো বড়ো গাছ ছিল। যেমন: তাল, নারিকেল, বটসহ নানা ধরনের গাছ বজ্রপাতের আঘাত নিজের শরীরে নিয়ে নিত। বিভিন্ন কারণে বড়ো গাছগুলো উজাড় হওয়ায় বজ্রপাতের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এরজন্য জরুরি প্রয়োজন বনায়ন।

লেখক: কলামিস্ট ও গবেষক

কবি সুফিয়া কামালের ১০৮তম জন্মবার্ষিকী

হোসেন জাহিদ

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি সারাজীবন নারীমুক্তি, মানবমুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে গেছেন। ২০শে জুন ২০১৯ সেই মহীয়সী নারী কবি বেগম সুফিয়া কামাল-এর ১০৮তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

কবি সুফিয়া কামালের মতো স্বশিক্ষিত ও সমাজপ্রগতি সচেতন নারীর আবির্ভাব ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। শায়েস্তাবাদে নানার বাড়ির রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড়ো হয়েও সুফিয়া কামালের মনোগঠনে দেশ, দেশের মানুষ ও সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সুফিয়া কামাল তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবেশে বাস করেও তিনি নিজ চেষ্টায় হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত।

১৯১৮ সাল তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর শিশুমনে রোকেয়া দর্শনের সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে, রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব তাঁকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করতে থাকে। ১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুফিয়ার সাক্ষাৎ হয়। এর পূর্বে গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কিছুদিন চরকায় সুতা কাটেন। তিনি এ সময় নারী কল্যাণমূলক সংগঠন মাতৃমঙ্গল-এ যোগ দেন। সুফিয়া কামালের পেশাজীবন শুরু হয় ১৯৩২ সালের তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর। তিনি কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৪২ সালে পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এর মাঝে ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কিছুকাল নারীদের জন্য প্রকাশিত সাময়িকী বেগমের সম্পাদক ছিলেন। সুফিয়া কামাল সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' সে সময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী সওগাতে প্রকাশিত হয়।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। ১৯৩৭ সালে তার গল্পের সংকলন 'কেয়ার কাঁটা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাঁঝের মায়া প্রকাশিত হয় যার মুখবন্ধ লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম। বইটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা কুড়ায় যাদের মাঝে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৪৮ সালে সুফিয়া কামাল ব্যাপকভাবে সমাজসেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। এ বছরই তাঁকে সভানেত্রী করে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সুলতানা পত্রিকা যার নামকরণ করা হয় বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমননীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কবি সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয়– প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি, বেদনাময় স্মৃতি, জাতীয় উৎসবাদি, স্বদেশানুরাগ, মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মানুভূতি। তাঁর কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিক, হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে রুশ ভাষায় তাঁর সাঁঝের মায়া গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। অন্তরঙ্গ আবেগের বিশিষ্ট পরিচর্যায় এবং ভাষাভঙ্গির সহজ আবেদনঘন স্পর্শে তাঁর কবিতা সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

তাঁর রচনাসমূহ:

কাব্যগ্রন্থ: সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৫৮), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), দিওয়ান (১৯৬৬), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মৃত্তিকার ঘ্রাণ (১৯৭০) ও মোর জাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)

গল্প: কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)

ভ্রমণ কাহিনি: সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)

স্মৃতিকথা: একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)

আত্মজীবনীমূলক রচনা: একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)

শিশুতোষ: ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮১)

অনুবাদ: সাঁঝের মায়া-বলশেভনী সুমের্কী (রুশ) (১৯৮৪)।

পুরস্কার: কবি সুফিয়া কামাল ৫০টির বেশি পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মাঝে কয়েকটি:

পাকিস্তান সরকারের তমসা-ই ইমতিয়াজ (১৯৬১), প্রত্যাখান (১৯৬৯), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২), সোভিয়েত লেলিন পদক (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), সংগ্রামী নারী পুরস্কার, চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৮১), মুক্তধারা পুরস্কার (১৯৮২), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), দেশবন্ধু সি আর দাস গোল্ড মেডেল (১৯৯৬) ও স্বাধীনতা দিবস পদক (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ আর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, কার্ফ্যু উপেক্ষা করে নীরব শোভাযাত্রা বের করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে আমৃত্যু তিনি সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

প্রকৃতি ও নারী প্রেমে মগ্ন মনীষী কবি জীবনানন্দ দাশ

শাফিকুর রাহী

নীলমনি কাঞ্চন কামিনী মধুমালতি আর রক্তজবার ডালে বুলবুলি টুনটুনি বাবুই মৌটুসির সুনিপুণ কারুশিল্পে মোড়া নীড়ের জাদুকরী নকশা– বিমূর্ত বিভায় এক অরণ্যপ্রেমীর মনের সীমান্তে ভেসে ওঠে। যার রূপময়ী প্রেয়সীর দীঘল কেশবিন্যাস কিংবা মায়াবী সুনয়নার চপলা চাহনী যেন পাখির নীড়ের মতো অদ্ভুত সুন্দর। সেই সৌন্দর্যকে তাৎপর্যময় উপমার রঙে রাঙিয়ে তিনি কবিতার মন ব্যাকুল শরীর নির্মাণ করেন এক অপূর্ব বিস্ময়কর আবেগ মিশিয়ে। আর সেই কবিতার শব্দমেদুরতা ছড়িয়ে পড়ে জ্যোৎস্নার প্লাবনে উদাসী চলনবিলে-হাওর-বাঁওড় কিংবা হাকালুকির জলের ঢেউয়ে হিমেল হাওয়ায়, তারুণ্যের প্রেমার্দ্য মনজমিন। প্রকৃতিপ্রিয় এ ধ্যানীর চিন্তার উদার আকাশে নির্ঘুম নক্ষত্র আর চাঁদের কান্না বাজে। শ্যামল প্রকৃতি আর সন্ধ্যা-সুরমা, পায়রা-পারুল কীর্তিনাশার জলসিঞ্চিনীর সোনালি আভায় তিনি মেঘবলাকার ছবি আঁকেন কবিতার নান্দনিক সৌন্দর্যকলায়। তাঁর রূপবর্ণনার আলোকছটা অরণ্যের গভীরে নীলিমার কিরণ থেকে ঝলসে ওঠে নানা রঙের কথামালা অভাবনীয় মন উদাস শব্দসৌকর্যে।

এই তপস্যারত ঋষি আধুনিক বাংলা কবিতায় স্বাতন্ত্র্য আবহ তৈরি করেছেন নিজের মতো করে। এমন গূঢ় গভীর স্বকীয়তা অন্য কোনো লেখক কবির মাঝে লক্ষ করা যায় না। আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে, তিনি নিজস্ব নিয়ম-রীতির বাইরে কখনো যাননি। তাঁর নির্মাণশৈলীর নিজস্ব ফরমেটকে তিনি কবিতা লেখার চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনায় রেখেছেন বিধায় খুব সাবলীলভাবে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিও আমরা লক্ষ করি। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। আমরা তাঁকে এবং তাঁর সে গৌরবোজ্জ্বল কর্মসাধনার ভেতর আবিষ্কার করব তাঁর রহস্যমণ্ডিত কাব্যভাষাকে। যিনি ক্রমাগত শব্দের ব্যবহার নিয়ে নানা মাতৃকতায় বিনির্মাণ করেন মনোমুগ্ধকর জড়োয়া সম্ভার। মেধাসিক্ত পাঠকরা আজো বিস্মিত হন কবির অমন গভীর গোপন ভালোবাসার বিপুল বিস্তারে। প্রকৃত কবির কাজ হলো মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর আনন্দে জাগিয়ে তোলা। কান্না-হাসির সুখ-দুঃখের ক্ষণিকের খেলাঘরে মানুষ যত বেশি স্বপ্ন দেখবে ততবেশি বিকশিত হবে তার মননশীল মনোলোক। স্বপ্নহীন জীবন আদতেই অর্থহীন।

নদীর কলতান আর পাখপাখালির গানে মুখরিত নির্জন পল্লির শিমুল-পলাশ দেবদারুর ছায়াসুনিবিড় পৌষের রোদেলা বৈকালিক ফাল্গুন কিংবা শান্তির শারদীয় সন্ধ্যায় এখানে এ স্বপ্নডাঙায় নেমে আসে এক প্রকৃতিপ্রেমী কবি মৃত্তিকার মায়াবী ছায়ার মায়াটানে। যার ধ্যানমগ্ন মনোলোক ধারণ করে বাংলা ও বাঙালির রূপ-লাবণ্যের মনকাড়া শব্দের নিসর্গচিত্র। যার কবিতায় বারবার বিবৃত হয়েছে নির্ঘুম বৃক্ষ ও পাখিদের সুখ-দুঃখের কহনকথা, মানবিক মূল্যবোধের গূঢ় গভীর মর্মবাণী। একজনমে এত ওলটপালট, এত মনোপীড়নের ভেতরও তিনি একজন বনলতা সেন কিংবা সুরঞ্জনার সুন্দরের জাদুকরী টানে পরম আপনকে খোঁজেন, হৃদয়ের অশ্রুতে মালা গাঁথেন প্রেমময়ী দরদীয়ার স্পর্শের আকুলতায়। অপমান-অবহেলা নির্মম কষ্টের নিদারুণ দাহে দগ্ধ নিমগ্ন ঋষির অন্তরের আয়নায় বারবার ভেসে ওঠে পদ্মফোটা বিলে ক্রীড়ারত হংসমিথুন আর মাছরাঙা, পানকৌড়ির জলডুব কিংবা গাঙশালিকের ডানার কম্পন। নির্ঘুম নক্ষত্রের হৃদয়ছেঁড়া কান্নার স্বর– একজন প্রকৃত কবিকে কীভাবে ভাবায় তা জীবনানন্দ দাশ প্রমাণ করেছেন তাঁর অসাধারণ সব কবিতার চিত্রকল্পে-উপমা উৎপ্রেক্ষায়। একজন প্রকৃতিপ্রেমী কবি কী নিপুণ দৃষ্টির প্রখরতায় নিসর্গের ছবি আঁকেন ভালোবাসার ক্যাম্পাসে– প্রেমের সাতকাহনে মোড়া-নক্ষত্রের ডানায় শিশিরমাখা লতাপাতার রূপকল্পে।

সারিসারি ভাটফুলের ঝোপে ঘেরা বনের ভেতর তৃষ্ণার্ত ভোমরার গুঞ্জরণ আর ফাগুনের আগুন রোদে ভূঁইচাপার ঝোপে ঝিঁঝি পোকাদের সুরধ্বনিতে প্রকৃতিও বুঝি হেসে ওঠে অজানা আনন্দে। একজন রূপবতী মায়াবী বনহরিণীর শান্তস্নিগ্ধ মেঘের গিলাপে তিনি একদণ্ড মাথা রেখে শান্তির অন্বেষণে ব্যাকুল মনোজমিনে বপন করেন নিশিপক্ষীর বুকভাঙা রোদন। সুরঞ্জনার প্রেমে মগ্ন মনীষী ভাবেন তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী হবে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত মানুষের নিশ্চিত নিরাপদ ঠিকানা। মানুষ আপন মনে হেঁটে বেড়াবে পৃথিবীর পথে আর বিনির্মাণ করবে সভ্যতার সোনালি সোপান। শুভ্র-সুনীল আলো-বাতাসে শারদীয় গজলের মনোরম সন্ধ্যায় আপনার স্বপ্নের কপোত-কপোতিরা আনন্দনৃত্যে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করবে। প্রকৃতির রূপ-রসে রাঙা শ্যামলিমা প্রেয়সীর শীতল ছায়াতলে গড়ে উঠবে ফুল-পাখিদের অভয়ারণ্য, বিবাদ বিভাজনহীন তাবৎ তল্লাটে পাপিয়া বুলবুলিরা সন্তরণের দারুণ আনন্দে হবে আত্মহারা আর বেহালার তালে তালে মাদলের সুর ঝংকারে জেগে উঠবে তিমিরনাশী তাপস, যার সৃজনের শ্রাবণধারায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হবে স্বাপ্নিক প্রাজ্ঞজনেরা।

কত না সুষমিত ছন্দ সৃষ্টিশীল মানুষের হৃদয় উদ্যান উদ্ভাসিত হয়। শত বাধার আঁধার ভেঙে এগিয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি অঙ্গীকার করেন মানবসভ্যতা বিকাশের অপ্রতিরোধ্য অভিযানে অতন্দ্রপ্রহরী বেশে। জাগ্রতপ্রাণে গেয়ে ওঠেন প্রেমময় কল্যাণের বাণী আর রাতজাগা নক্ষত্রের কান্না। জটিল ও কঠিন সময় অতিক্রমের আনন্দ-বেদনার দোলাচালে ঘূর্ণায়মান মনোবীণার তারে সুর মূর্ছনায় শ্রাবণধারায় আবেগস্নাত হন অরণ্যপ্রিয় কবি। একজন কবি কীভাবে

জগতের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার, পাওয়া না পাওয়ার মনোযাতনায় জ্বলেপুড়েও নিজের মাঝে নিজেকে আড়াল করেন কবিতার সুনিপুণ কারুকাজের ভেতর তা ভাবনারও অতীত। কবি ব্যক্তি ও সাংসারিক জীবনে চরম দুঃখকষ্টকে বহুবার আলিঙ্গন করেছেন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহনশীল মনোতপস্যার ভেতর দিয়ে। তিনি নীরবে নিভৃতে সয়ে গেছেন মানুষের অযাচিত অপবাদ, বেদনার কুড়াল আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে তার শৈল্পিক মনোলোক। এতকিছুর পরও মুখ খুলে কাউকে তেমন কিছু বলার কিংবা প্রতিবাদ করার নজির তাঁর কাব্যভাষার অন্তর্নিহিত ভাবনায় খুঁজে পাওয়া ভার। ক্ষণিকের মানব পারাবারে কতো ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত; কে কার খবর রাখে! এত ব্যর্থতার গ্লানির ভারে নিমজ্জিত হয়েও তিনি কতটা সফল ও সার্থক কবি এ সময়ে এসেও তা কি ভাবা যায়? মোটেও না। তাঁর অসাধারণ লোকজ জ্ঞানগর্ভ কবিতার মর্মস্পর্শী বাণী আজো ঈগলের সোনালি ডানায় সৌরভ ছড়ায়। বরিশাল ঢাকায় কলকাতায়ই শুধু নয় সমগ্র লোকালয়ে, তাঁর রচিত শব্দকলায় মানবীয় আবাহনে সমুদ্র তলদেশে জেগে উঠবে একদিন হীরকখচিত রুপালি জমিন। যে জমিনে চাষ হবে তিমিরবিনাশী রক্তগোলাপ কিংবা চন্দ্রমল্লিকার।

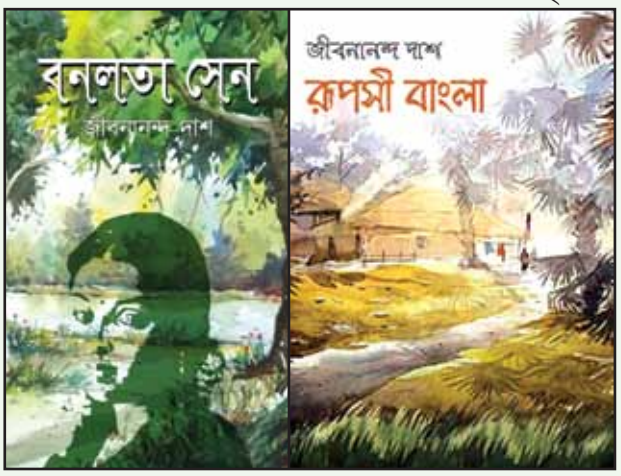

কবি জীবনানন্দ দাশ যখন মায়ের গর্ভে তখন কুসুমকুমারি দাশ এক অসাধারণ কবিতা রচনা করলেন। যার বাণী এভাবে সন্তানের উপর পুরোপুরি প্রয়োগ হবে প্রকৃতভাবে তা সত্যি বিস্ময়ের ও অতুলনীয়। সে কবিতার প্রতিটি শব্দ-উপমা শতভাগই যেন সন্তানের দীর্ঘ পথচলায়– আমরা উপলব্ধি করতে পারি। যেমন– 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'। এ কবিতাটির ভাবার্থ কবি জীবনানন্দের মেধা-প্রজ্ঞায় অনিবার্যভাবে সত্যে পরিণত হলো। তাঁর জীবন সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে আমরা তা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে সৃষ্টিকর্তা যেন মায়ের ব্যাকুল আরাধনা কবুল করেছেন নির্দ্বিধায়। এ কবিতার আদর্শিক বাণী কিংবা শব্দ সম্ভাষণের ভেতর লক্ষ করলে দেখা যায় কবিও তাঁর চলার পথে প্রবল প্রভায় মায়ের সে আকুতির সফল বাস্তবায়নে সোনালি সাক্ষর রেখেছেন। এটা এক বিরল দৃষ্টান্তও বটে। কারণ কবি খুব মৃদুভাষী ও রাসভারি মানুষ ছিলেন। কখনো উচ্চঃস্বরে কথা বলতেন না, সারাক্ষণ কাজের মাঝে ডুবে থাকতেন, সভা-সমাবেশেও খুব একটা যেতেন না বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠকরা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন যে, কবিরা নাকি কম কথা বলে থাকেন। নিরীহপ্রাণ কবিরা নীরবে নিভৃতে লিখে চলেন। যদিও বিশ্বের অধিকাংশ কবিই বোহেমিয়ান ও দুরন্ত খেয়ালি স্বভাবের হয়ে থাকেন। যার অনেক নমুনা বিশ্বসাহিত্য এবং আমাদের বাংলা সাহিত্যের কবিদের জীবনাচরণে লক্ষ করে থাকি। মাইকেল-নজরুল, ইংরেজ কবি লর্ড বায়রন ও তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতসহ এমন আরো অনেকেই আছেন এই তালিকায়। কবিরা তো সবসময়ই সোচ্চার থাকবেন আর প্রতিবাদী শব্দকলায় নিজেকে জানান দেবেন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে। সেদিক থেকে জীবনানন্দ বেদনাবিলাসী কবি ছিলেন বলে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কেউ কেউ। আসলে তিনি চরম দুঃখকে আপন আলোয় আবিষ্কার করেন গভীরতম মনোপলব্ধির ভেতর লুকানো শব্দখামারে। যার প্রকাশ ভঙ্গিও ছিল মৃত্তিকার ছায়াঘেরা মায়ার মতো বিমূর্ত। তাঁর রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, সুরঞ্জনা, ধূসর পাণ্ডুলিপির মনকাড়া কথামালা আজো আপন আলোয় নেচে ওঠে বাবলার বনে, ধানসিঁড়ির পাড়ে মাছরাঙার রঙিন পালকে, শ্যামা কান্তি-ষোড়শীর বেনির ভাঁজে, বাজিকর চোখের মায়ার্দ্য হাসিতে। কান্তার অদ্ভুত রমণীয় সৌন্দর্যের চিত্রকল্প আনন্দ-বেদনার রূপগাথায় বনবনানীর শ্যামল গালিচায়, ভারতসমুদ্র কিংবা ভূমধ্যসাগরের ঊর্মিমালা যেন তাঁর সেই কবিতার উৎসস্থল। যা পাঠে পাঠকগণ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেন, নিজেকে খুঁজতে শুরু করেন কোনো মায়াবী ডাহুকীর রঙিন ডানায় হলুদাভ চঞ্চুতে।

যেন শ্যামলিমার মন জয় করলেন অপ্রতিরোধ্য-নিরহংকার এক ভাবুক কবি। বসত ভিটেহীন এক সন্ন্যাসের মরমীয় প্রেমকীর্তনে জেগে ওঠে ভীষণ ঘুমকাতুরে দোয়েল আর ধানশালিকের দল। কবির বেদনাবিধুর কহনকথায় শব্দালংকারে উপমায় সৃজিত কবিতায় অসামান্য প্রকাশভঙ্গি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা। যেমন– 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও– আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাবো' কিংবা 'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর'। অমন দেশপ্রেমের কথা-ব্যাকুলতা সচেতন পাঠককে প্রাণিত করে। গভীর অন্ধকারে প্রেমিকযুগল চন্দ্রিমাপ্রভায় আনন্দে নেচে ওঠে আগামীকে জয়ের স্বপ্নে। আত্মমগ্ন এই মনীষীর তাপিত আত্মার তারে দোল খায় সারাক্ষণ অভিমানী লক্ষ্মীপেঁচার ডানার শব্দ। বাংলার অপরূপ অষ্টাদশী রূপসীর আলতারাঙা পদযুগলের পরম স্পর্শে ঘাসফড়িং আর প্রজাপতিরা আনন্দে নেচে ওঠে। শরৎ হেমন্তের শিশিরের শব্দের সাথে যার কবিতারা কথা বলে প্রেমার্দ্র বাতাসের তালে তালে। কোকিলার বসন্ত আবাহনে প্রাণকাড়া সুরে জেগে ওঠে সৌন্দর্যপিপাসু মানব-মানবীর আত্মার উদ্যান।

জীবনানন্দ দাশের পূর্ব পুরুষের আদিনিবাস বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। আজ তা পদ্মার আততায়ী থাবায় বিলীন। চাকরির সুবাদে তাঁর পিতা-পিতামহ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়েন। কবির জন্ম ১৮৯৯ সালে (৬ ফাল্গুন, ১৩০৫) পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে। মাধ্যমিকের পর তিনি ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. (১৯২১)। উচ্চশিক্ষা লাভের পরও একজন কবিকে এত কষ্টে দিন যাপন করতে হয় তা ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে। বেকারত্বের যন্ত্রণায় বেখেয়ালি কবির উদাসী মনোমাঠে দুঃখরা হামাগুড়ি খেলে। এমন অমীমাংসিত মনোপীড়নে কখনো কখনো ভাবনার অথৈ আঁধারে খেই হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। আধুনিক বাংলা কবিতার এ মহৎতম কবির সৃষ্টিসাধনায় কত গভীরভাবে উন্মোচিত হয়েছে মানবমানবী আর প্রকৃতির প্রেম এ দুই প্রেমের সন্ধিতে কখনোবা একাকার হয়েছে দেশমাতৃকা। নির্জন নিসর্গের কারুকলায় রহস্যমণ্ডিত তাঁর কবিতা। এক অপূর্ব সুরেলা বাণীতে আর চিত্রকল্পে শীতার্ত ভোরের কুয়াশায় ভেজা মেঘবালিকার ডানার চিত্রপট যেন সেই কবিতা।

জীবনের শেষ বিকেলে এসে হারানো মধুমাখা অতীত স্মৃতিকে কিছুটা হলেও ফিরে পেয়েছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনায়

যোগদানের পর। কলেজ ক্যাম্পাসের মাঝখানে পুকুর, আর চারদিকে বৃক্ষশোভিত তরুলতায় ঘেরা-গাছের ছায়ায় সন্ধ্যা-সকাল কী মনোরম সুন্দর খেলা করে বাতাসের সাম্পানে। এখানের শিক্ষক-ছাত্রীদের আচার-আচরণে কবিও মুগ্ধ হলেন। তারপরও গভীর অন্ধকার তাঁর পিছু ছাড়ে না! কত না অজানা দুঃস্বপ্নরা তাঁকে তাড়া করে প্রতিনিয়ত। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি কখনো হার মানতে রাজি নন। দুঃসহ দুর্গতির মাঝেও প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন সকল সংকট মোকাবিলায়। কবি ভাবেন বরিশালের সেই মনোরম পরিবেশের কথা, 'ধান-নদী-খাল এ তিনে বরিশাল।' সেখানে কী এক মেদুর স্বপ্ন জাগানিয়া গুঞ্জরণ বাজে নীলুয়া বাতাসের বানে, তা একজন প্রকৃত কবি ছাড়া কে আর ভাববে অমন করে! যে লোকালয়-নদী ও নারীর মতো কথা বলে আর জলতরঙ্গের স্রোতধারায় মানবীয়া হাসিতে দূর থেকে ভেসে আসে কোনো এক আপনহারার বিরহী বাঁশির সুর, প্রাকৃতিক আবহে রাত জেগে জেগে আনন্দ বাবু নক্ষত্রের সাথে কথা বলেন, পাখির কান্নায় আবেগীয় ছবি আঁকেন কবিতার ছন্দে।

পাখিরা বৃক্ষের প্রেমে না পড়ে থাকতে পারে না। বনহরিণীরও প্রেমে পড়তে হয় লতাগুল্ম বৃক্ষের ছায়াতলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কী ব্যাকুল; কী চঞ্চল হরিণী। নারী-পুরুষের প্রেমে পড়ে, পুরুষও তাই। কিন্তু নদনদী কার প্রেমে পড়ে; কোন নিভৃতচারী কবিকে তার কোলে তুলে নেয়? কবি- সে নদীর প্রেমে পড়ে সহধর্মিণীর সেবাযত্ন-আপন আবাস ছেড়ে বছরের পর বছর নদীর জলতরঙ্গে নিজেকে খুঁজেছেন অসংখ্য শরৎ সন্ধ্যায়। বর্ষার স্রোতস্বীনির উত্তাল জলে ভেসে ভেসে রাত জেগে নদীর বুকে কান পেতে নদীর কান্না শুনতেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কিন্তু বনারণ্যের প্রেমে পড়েননি এটা বলা যাবে না, কারণ তাঁর অজস্র গান কবিতায় এ দেশের প্রকৃতির রূপলাবণ্যের ফুলফসলের পাখির কুজনের মর্মগাথায় আমরা তা লক্ষ করি। জীবনানন্দ দাশ এ ব্যাপারে খুব আলাদা। তাঁর ধ্যানে-জ্ঞানে বন-বনানী ঘেরা নিসর্গমণ্ডিত ছায়াবিথীর ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাই তো কবিগুরুর কবিতায় আমরা যা না দেখি বা দেখতে পাই না, তার বিপুল বিস্তার লক্ষ করা যায় জীবনানন্দের খয়েরি ডানার পাতিহাঁসের ডিমে তা দেওয়ার রূপকল্পে, বেতবনে ঘুঘুর নিরাপদ বসবাসের নিপুণ আবাসনে। এ রকম আরো অসংখ্য ফুল-পাখি-লতাপাতা সুশোভিত বৃক্ষ- কার্তিক-অগ্রহায়ণে শিশিরের শব্দ নানা মাতৃকতায় তিনি উপস্থাপন করেছেন অবলীলায় আপন আভায়। কাব্যদেবী তাঁর উপর ভর করেছে অলৌকিক শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে! তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান কবি, যদিও তা জীবদ্দশায় সে সফলতার আনন্দ পুষ্পবৃষ্টি দেখে যেতে পারেন নি। এটাই কবির অপূর্ণতা কিংবা নির্মম ট্রাজেডি।

কবিগুরু যেভাবে পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন আমার কবিতা পড়ে যারা কবি হবেন আমি তাদের জন্য কবিতা লিখি। তবে জীবনানন্দ দাশ যদিও সে কথা বলেননি কোথাও তারপরও বলতে হয়, আপনার কবিতা পড়েও যে কোনো মেধাবী তরুণ-তরুণী পুরোপুরি কবি হতে না পারলেও অন্তত কবির শুদ্ধ ভাব আবেগ তাদের ভেতর জাগ্রত হবে এবং সেটা অনুভব করতে প্রয়াসী হবে। আবার কেউ কেউ প্রকৃত কবি হয়েও উঠতে পারেন তাদের আত্মত্যাগে কঠিন কঠোর সাধনায় অকৃত্রিম তপস্যায়। রহস্যঘেরা এ ভুবনমাঝারে জগতপাথারে নিজেকে আবিষ্কার করার স্বপ্ন দেখতে হবে, মাটি-মানুষের প্রেমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকতে হবে। নিজেকে জানার তীব্র ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করতে হবে সারাক্ষণ সারাবেলা। ইতিহাস পাঠের সাথে সাথে প্রকৃতি পাঠেও মনোনিবেশ করতে হবে খুব দৃঢ়তার সাথে, কবি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার অনলে আঙার হবো এমন অঙ্গীকারও থাকতে হবে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর, আপন ব্যক্তিসত্তাকে জানতে হবে সবার আগে। সচেতন হতে হবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকভাবে, সত্য উচ্চারণে হতে হবে দ্বিধাহীন, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে থাকতে হবে আপোশহীন।

মানবসভ্যতার বিবর্তনে কবিতার বিষয়বস্তু ও বাঁক ক্রমাগত পাল্টে যেতে থাকে। এমনও হয় যে, মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির ওপর তা নির্ভর করে। স্মৃতিশক্তি মেধা-প্রজ্ঞায় নানা আঙ্গিকে রূপায়নের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে যায় আকস্মিকভাবে। জীবন জীবিকার সন্ধানে কারো আবার রূপরেখাও ভিন্নতর হতে পারে! মানুষ মাত্রই সৃষ্টিশীল, সাধারণ মানুষও তো কিছু না কিছু একটা করে তার আপন অনুভূতির ভেতর নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করে থাকে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের বিবেকের চুলোয় শান দিতে হয় প্রতিনিয়ত। সে কাজটিই করে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর দেশপ্রেম- প্রকৃতিপ্রেম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। মুক্ত জ্ঞানচর্চায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে।

জীবনানন্দ দাশ– আপনি আধুনিক বাংলা কবিতার অসামান্য রূপকার ধ্যানমগ্ন মনীষী। জীবনে কতো না সমালোচনা, কতো ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে আপনাকে অতি কাছের মানুষদের নিকট থেকেও। আমরা এটাও জানি যে আমাদের বেশি জানা পণ্ডিতদের আলোচনা-সমালোচনায়ও আপনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন বারবার। সে সময়কার অনেক গুণিজনও আপনার সৃষ্টিকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার মৃত্যুর রহস্য অনেকটা উদ্ঘাটন হয়েছে নানাজনের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে। সত্যিকার অর্থেই এটা এক ধরনের আত্মহত্যা– কারণ মৃত্যুর বহুদিন আগ থেকেই মৃত্যু নিয়ে অনেক লেখায় বিশদ বিবরণ দিয়েছেন নানাভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে।

কবি মৃত্যুর হিমশীতল যন্ত্রণা অনুভব করছেন বহুমাত্রিকতায় তা বিবৃত হয়েছে কবিতার শৈল্পিক কারুকাজের ভেতর। একজন প্রকৃত কবির জীবন এতটা নির্মম এত অবহেলা অপমানের অনলে দগ্ধ হয় কিভাবে? জীবনানন্দ দাশের অতি বেদনার স্বরলিপি এইভাবে অসমাপ্ত জীবন আলো-আঁধারের ভেতর আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাবে অস্বাভাবিকভাবে তা ছিলো ভাবনার অতীত। তাঁর প্রিয় একটি শব্দ করুণ- বহুবার উচ্চারিত। এ শব্দটি সৃজনধারায় ভেসে ভেসে তাঁর কলমের কালিতে আর মনের লুকানো আঙিনায় বিকশিত হয়েছে। কবির চির বিদায়ের ক্ষণটিও করুণ, বিষাদে ভরা। ট্রামের ধাক্কায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পতিত অচল শরীরেও তিনি ভেবেছেন বুঝি এ বাংলায় রয়ে যাবেন চিরকাল, সত্যিই বেঁচে থাকবেন তিনি বাংলার সচেতন পাঠক সমাজে। কোনো মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে না; বেঁচে থাকে তাঁর অসামান্য অবদান। বাংলার বৃক্ষশোভিত অরণ্য উদ্যানের নানারকম তরুলতা ফুল-পাখির সুখ-দুঃখের জীবন আখ্যান অন্য কোনো কবির কবিতায় সেভাবে দেখা যায় না।

বাংলার অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি নানাভাবে তাঁর শব্দশৈলীতে বর্ণনায়িত হয়। যা কিনা রূপসী বাংলার সচেতন পাঠক সমাজকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এ ধ্যানমগ্ন স্বপ্নসাধক মহান কবির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন অনাদিকাল। কবি ও কবিতার জয় হোক, দুনিয়ার সকল পীড়িত-বঞ্চিত মানবতা জাগ্রত হোক। বিশ্বের সকল অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসের বিনাশ হোক, কবি আর কবিতার জয়গানে মানবতা বিকশিত হোক, সত্য ও সুন্দরের জাগরণে অসুন্দর অসুরের পতন ঘটুক।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল ও তার ফল

মিতা খান

বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্র্যময় একটি দেশ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এ দু'মাস গ্রীষ্ম ঋতু বলে ধরে নিলেও চৈত্রের শেষ থেকে শরতের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের দাবদাহ চলে। গ্রীষ্মের রূপ প্রচণ্ড। রৌদ্র-দীপ্ত পৌরুষ তার। প্রচণ্ড খরতাপে উত্তপ্ত করে মৃত্তিকার কোমল বক্ষ। জলাধার শুকিয়ে যায়। মরু তৃষ্ণার হাহাকারে ভরে যায় মাঠঘাট-প্রান্তর। ধুলায় ধূসর ভয়াল গ্রীষ্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

দারুণ অগ্নিবান
হৃদয় তৃষ্ণা হানে
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন।

গ্রীষ্মের কালবৈশাখের দুরন্ত ঝাপটায় প্রকৃতি হয় ক্ষতবিক্ষত। প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা ও ঝড় বৃষ্টির পর তৃষিত পৃথিবী শীতল হয়। ফলে রসার্দ্র মাটির কোমল বুকে জেগে ওঠে নবীন তৃণাঙ্কুর। গ্রীষ্মের তাপদাহের মাঝেও প্রকৃতি নানা রঙে সাজে আপন রঙে। ঋতু রাজ বসন্ত হলেও গ্রীষ্মকে পুষ্প উৎসবের ঋতু বলা যায়। কেননা এ সময় নানা রঙের ফুলের সমাহার ঘটে। সে রং এতটাই আবেদনময়ী যে চোখ ফেরানো যায় না। গ্রীষ্মের অগ্নি ঝরা রোদে প্রকৃতির মাঝে উঁকি মারে কৃষ্ণচূড়া। অনেকদূর থেকেও কৃষ্ণচূড়ার রঙিন শোভা সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

বসন্তের কয়েকদিন থাকতেই ফুটতে শুরু করে জারুল। যা গ্রীষ্মকেই রঙিন করে তোলে। তাই গ্রীষ্মকে বর্ণিল করতে জারুলের অনেক অবদান। গ্রীষ্মের প্রকৃতিতে নতুনভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে নীলচে বেগুনি রঙের জ্যাকারান্ডার। এ সময় রঙিন ও উত্তপ্ত গ্রীষ্মকে আরো রঙিন করে তোলে কনকচূড়া। এ ফুলকে অনেকে রাধাচূড়া ভাবে। আসলে এর নাম কনকচূড়া বা স্বর্ণচাপা। তাই গ্রীষ্মকে ঘিরে লেখকরা রচনা করেছেন অনবদ্য গদ্য-পদ্য। গ্রীষ্মের ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য হয়েছে ঋদ্ধ থেকে ঋদ্ধতর।

এত কিছুর পরেও গ্রীষ্ম নিয়ে মানুষের আনন্দ উল্লাস আর আগ্রহের কমতি নেই। কেননা গ্রীষ্ম শুধু ধ্বংস খরতাপ নিয়ে আসে না, তার সাথে নিয়ে আসে নানা স্বাদের টক-মিষ্টি নানা রকমের ফলের সমাহার। যা গ্রীষ্মের সব ধ্বংস আর খরতাপকে ভুলিয়ে মানুষের মুখে হাসি ফোটায়। তাই এ লেখায় গ্রীষ্মকালীন কিছু ফলের কথা তুলে ধরা হলো:

কাঁঠাল

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও জাতীয় ফল। সারা বাংলাদেশে জন্মালেও নওগাঁ, দিনাজপুর, সাভার, মধুপুর ও সিলেট কাঁঠাল প্রধান এলাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এদেশে বছরে ৭ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন কাঁঠাল ফলে।

কাঁঠাল গাছ চিরসবুজ এক বৃক্ষ, ৯-১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু, দুধকষভরা। কাণ্ড খাড়া, গোড়ার কাছে সাধারণত শাখা বিভক্ত। কাঁঠাল গাছের জন্য আদ্র ও উষ্ণ জলবায়ু, মাটিতে পর্যাপ্ত আদ্রতা, গভীর দোআঁশ মাটি, উত্তম পানি নির্গম ব্যবস্থা আবশ্যক। কাঁঠাল গাছে ফুল আসে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এবং ফল পাকে মে-জুলাই মাসে।

কাঁঠাল অনেক পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি ফল। এতে আছে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং নায়াসিনসহ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান। অন্যদিকে কাঁঠালে

প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানব দেহের জন্য বিশেষ উপকারী। কাঁঠাল খুব মিষ্টি এবং উপকারী ফল। কাঁচা কাঁঠাল দিয়ে খুবই সুস্বাদু তরকারি রান্না করা যায়। এ তরকারিকে বলা হয় এঁচোড়। পাকা কাঁঠালের রসালো কোষ খুবই সুস্বাদু। কাঁঠালের বিচি তরকারির সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। কাঁঠালের কোষ খাওয়ার পর যে খোসা ও ভুতরো থাকে তা গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কাঁঠালে ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা কম। কাঁঠাল পটাশিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। ১০০ গ্রাম কাঁঠালে পটাশিয়ামের পরিমাণ ৩০৩ মিলিগ্রাম। পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ থাকায় রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। এ ফলের অন্যতম উপযোগিতা হলো ভিটামিন সি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করে ভিটামিন সি।

কাঁঠালে বিদ্যমান ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস যা আলসার, ক্যানসার এবং বার্ধক্য প্রতিরোধে সক্ষম। এছাড়াও কাঁঠালে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট– যা আমাদের দেহকে ক্ষতিকর ফ্রিরাডিকেলস থেকে রক্ষা করে। এ ফল আমাদের সর্দি কাশি রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। টেনশন এবং নার্ভাসনেস কমাতেও কাঁঠাল বেশ কার্যকরী। কাঁঠাল রক্তে শর্করা বা চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। হাড়ের গঠন ও হাড় শক্তিশালী করে। কাঁঠাল হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে, প্রতিদিন ২০০ গ্রাম তাজা পাকা কাঁঠাল খেলে গর্ভবতী মহিলা ও তার গর্ভধারণকৃত শিশুর সব ধরনের পুষ্টির অভাব দূর হয়। দুগ্ধদানকারী মা তাজা পাকা কাঁঠাল খেলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ফল আঁশালো বিধায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এছাড়া কাঁঠাল গাছের পাতা গবাদি পশুর একটি প্রিয় খাদ্য। এ গাছের কাঠ আসবাবপত্র ও বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই কম বেশি কাঁঠাল পাওয়া যায়। এছাড়াও ভারতের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ভারত, বিহার এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কাতেও কাঁঠালের চাষ হয়।

আম

গ্রীষ্মমণ্ডলের ও উপ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, আম বাংলাদেশ, আসাম (ভারত) ও মিয়ানমারসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় একটি ফল। ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা ফলাদির মধ্যে আমের ব্যবহার সর্বাধিক। কথিত আছে, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকে একটি আম্রকানন উপহার দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি তাঁর ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারেন। প্রাচীনকালে আমের কদর আর গুরুত্ব বোঝাতে সংস্কৃতে এর নামকরণ করা হয় আম, যার অর্থ মজুদ খাদ্য বা রসদ। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ৬৩২ থেকে ৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ধারণা করা হয় তিনিই আমকে সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে পরিচিত করান।

বাংলাদেশের আমের কথা লিখেছেন আর এক বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা। মোগল সম্রাট আকবর তাঁর শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে) ভারতের লাখবাগের দারভাঙার সন্নিকটে প্রায় এক লক্ষ আম গাছ রোপণ করেছিলেন। আম এবং আমগাছের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার ২০১০ সালের ১৫ই নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। আমের বংশ বিস্তারে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অধীনে দেশব্যাপী বিস্তৃত উন্নতজাতের আমের বাগান, খামার ও নার্সারি থেকে উন্নতজাতের গাছের জোড়কলম উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের হর্টিকালচার বিভাগ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ এবং জয়দেবপুরে একটি করে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

আমগাছ চিরসবুজ, কাণ্ড, বৃহদাকার, বাকল খসখসে ও কালচে রঙের, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ও পাতা ঘন। বেশ ফাঁকে ফাঁকে আম চারা রোপণ করা হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে উপর দিকে ছাতার আকৃতি ধারণ করে এবং প্রায় ২০ মিটার উঁচু ও ৩০ মিটার প্রশস্ত হতে পারে এ গাছ। আম কাঠ ধূসর রঙের, মোটা আঁশযুক্ত। হলদেটে সাদা বা বেগুনি বর্ণের ও সুগন্ধযুক্ত মুকুল পত্রগুচ্ছের মাথায় ঝুরির আকারে জন্মে। প্রতিটি মঞ্জরিতে ১০০-২০৫টি মুকুল ধরে, তবে সবগুলো নাও ফুটতে পারে। আম মসৃণ, কিছুটা আটঁসাঁট, শাঁসালো, এক আঁশযুক্ত ফল। এই ফল গোলাকার, ডিম্বাকার, হৃৎপিণ্ডাকার, বৃত্তাকার, লম্বা বা সরু আকৃতির হয়ে থাকে। কাঁচা আম সাধারণত সবুজ, পাকলে সবুজাভ হলুদ, কমলা মিশ্র রঙের লাল আভাযুক্ত এমনকি সবুজ রঙের হতে পারে। পাকা আম আকারে ও গুণে নানা রকমের হতে পারে। ক্ষুদ্রতম আম আলু বোখারার চেয়ে বড়ো হয় না, আর বড়ো প্রজাতির একেকটি আমের ওজন হয় ৭৫০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত।

আম বাংলাদেশের একটি সুস্বাদু ফল। কাঁচা আমের ভর্তা অনেক স্বাদের। কাঁচা আমের জুসও অনেক স্বাদের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও প্রিয় ছিল কাঁচা আমের জুস।

আমগাছ সারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জন্মে কিন্তু এর মূলত রোপণ হয় বসতবাড়ির গাছ হিসেবে। এদেশের আমের প্রধানত দুটি জাত রয়েছে যথা: উন্নত বা অভিজাত, যা জোড়কলম ও অন্যান্য অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে; স্থানীয়ভাবে যার বংশবিস্তার ঘটে বীজ থেকে উৎপন্ন চারার মাধ্যমে। এ ধরনের আম স্থানীয়ভাবে দেশি আম বা গুটি আম হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই কম বেশি আম হয়। তবে উত্তরাঞ্চলে আম বেশি চাষ হয়। এর মধ্যে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও দিনাজপুর আমের জন্যই বিখ্যাত। বাজারে এসব আমের চাহিদা বেশি এবং এ জাতগুলো বাণিজ্যিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ প্রজাতির আম আছে। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ফজলি, লেংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, খিরসা, অরণ্য, আম্রপালি, মল্লিকা, সুবর্ণরেখা, মিশ্রিদানা, নিলাম্বরী, কালীভোগ, কাচামিঠা, আলফানসো, বারোমাসি, তোতাপুরি, কারাবাউ, গোপাল খাস, কেন্ট, সূর্যপুরি, পাহুতান, ত্রিফলা ইত্যাদি।

আম যেমন সুস্বাদু তেমনি উপকারি একটি ফল। ১০০ গ্রাম আমে ক্যালরি আছে ৬০.১৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ০.৮২ গ্রাম। আমে ভিটামিন আছে এ, বি, সি এবং মিনারেল আছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিঙ্ক। আম ক্যানসার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। ভিটামিন এ চোখের দৃষ্টি ও ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উষ্ণ প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে আমের চাষ হয়েছে। তবে এর প্রায় অর্ধেক আম উৎপাদন হয় শুধু ভারতে। এরপর অন্যান্য যেসব দেশে আম উৎপাদন হয় তার মধ্যে– চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা অন্যতম।

লিচু

গন্ধ, রস ও স্বাদের মাধুর্যে লিচু দেশ-বিদেশে অনেক জনপ্রিয় একটি ফল। এর মূল আবাস চীন দেশে, বার্মা ও ভারতে পৌঁছায় ১৭শ শতকে। বাংলাদেশের যেসব জেলায় লিচু জন্মে তাহলো–

রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ। দেশের বৃক্ষজাত ফলের মধ্যে আমের পরই লিচুর স্থান।

লিচু পর্যাপ্ত ডালপালাসহ মাঝারি থেকে বড়ো গাছ, ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু, উপরিভাগ গোল, চিরসবুজ। এর কচিপাতা তামাটে। এ ফল একবীজ বিশিষ্ট, ধরে থোকা থোকা, আকার ও আকৃতি বিবিধ। লিচুর জন্য উষ্ণ আদ্র জলবায়ু আবশ্যক। গভীর দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য সর্বোত্তম।

লিচু যেমন সুস্বাদু, তেমনি উপকারি ফল। লিচুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অলিবল রয়েছে– যা অ্যান্টি অক্সিজেন ও অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জা দমনে অত্যন্ত কার্যকর। এটি রক্তের প্রবাহ সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে ও সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাব থেকে ত্বককে সুরক্ষা করে। লিচুতে বিদ্যমান ভিটামিন সি মানবদেহে ক্ষতিকর জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ ফলে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে লিচু গাছে ফল আসে। মে মাস থেকে লিচু বাজারে পাওয়া যায়। লিচুর বোটার সঙ্গে কিছু পাতাসহ ছোটো ডাল ভেঙে সংগ্রহ করতে হয়। গাছ থেকে লিচু সংগ্রহের পর লিচুকে সাধারণত ২-৩ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই লিচু চাষ করা হয়। লিচু উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে– ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, জাপানের দক্ষিণাংশ, ফরমোজা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও ভারত উল্লেখযোগ্য।

জাম

জাম গ্রামবাংলার চিরচেনা একটি ফল। আম, কাঁঠালের মতো জামও প্রিয় ফল। জাম নানা নামে পরিচিত যেমন: জাম্বুল, জাম্বুল, জাম্বু, জাম্বুলা, জাভা প্লাম, জামুন, কালোজাম, জামব্লাং, জাম্বোলান, ড্যামসন প্লাম, ডুহাট প্লাম, জাম্বোলান প্লাম ও পর্তুগিজ প্লাম ইত্যাদি।

মার্চ-এপ্রিলে জাম গাছে ফুল আসে। জামের ফুল ছোটো এবং ঘ্রাণওয়ালা। মে-জুন মাসে ফল বড়ো হয়। ফলটি লম্বাটে ডিম্বাকার আকৃতির হয়। শুরুতে এটি সবুজ থাকে যা পরে গোলাপি হয় এবং পাকলে কালো বা কালচে বেগুনি হয়ে যায়।

জাম ভারতবর্ষ থেকে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়েছে এবং বর্তমানে এটি সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে বেশ দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রধানত দুই জাতের জাম পাওয়া যায়। জাতগুলো হলো– ক্ষুদি যা খুব ছোটো জাত এবং মহিষে যা বেশ বড়ো ও মিষ্টি। এটি বর্ষাকালে পাওয়া যায়। লিচুর গা কালো এবং খুব মসৃণ পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা। ফলের বহিরাবরণের ঠিক নিচ থেকেই গাঢ় গোলাপি রঙের টক মিষ্টি শাস থাকে।

জাম গরমে ঠান্ডাজনিত জ্বর, কাশি ও টনসিল ফুলে যাওয়া প্রতিরোধ করে। দূর করে জ্বর জ্বর ভাব। আর দাঁত, চুল ও ত্বক সুন্দর করতেও এর অবদান অপরিসীম। এ ফল দৃষ্টি শক্তিকেও করে শক্তিশালী। ক্যানসারের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য জামে রয়েছে চমকপ্রদ শক্তি। জাম মুখের ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে চোখের অঙ্গ ও স্নায়ুগুলোকে কর্মময় করতে সাহায্য করে। গর্ভবতী মা, বাড়ন্ত শিশুদের জন্যও এই ফল ভীষণ উপকারী। জাম স্মৃতিশক্তি প্রখর রাখতে সাহায্য করে। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে জামের আঁশ তা দূর করে। জাম হৃদপিণ্ডের অসুখের জন্যও খুবই কার্যকরী। জাম জরায়ু, ডিম্বাশয়, মলদ্বার ও মুখের ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

জাম কবিরাজী বা হেকিমী চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং

চীনে জামের ব্যবহার হয়ে আসছে। জামের বীজ দিয়ে নানান রোগের আয়ুর্বেদী চিকিৎসা করা হয়। যেমন: বহুমুত্র। ইউনানী এবং চৈনিক চিকিৎসাতেও এর ব্যবহার আছে। হজমের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, মাড়ির প্রদাহ ইত্যাদি রোগে জামের বীজ, ছাল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। জাম থেকে মদ ও সিরকা তৈরি করা হয়। জামে ভিটামিন এ এবং সি আছে।

তরমুজ

তরমুজ একটি গ্রীষ্মকালীন সুস্বাদু ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। এ ফলে ৬% চিনি এবং ৯২% পানি এবং অনন্য উপাদান ২%। তরমুজে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি এবং মিনারেল। এছাড়া রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিঙ্ক। উচ্চমাত্রার পটাশিয়াম রক্তচাপ ও স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে, কিডনিতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত হাড় ক্ষয় রোধ করে। তরমুজের রস খেলে তৎক্ষণাৎ ক্লান্তি দূর হয়। তরমুজ নানা ধরনের ক্যানসার প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। তরমুজ শরীরে মেটাবলিজম বাড়িয়ে ওজন কমাতে সহায়তা করে। তরমুজের বিশেষ কয়েক ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে রক্তের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালি বজায় রাখে। উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ আছে। এতে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণও অনেক। বিটা ক্যারোটিন চোখ ভালো রাখে। প্রতিদিন ২ কাপের মতো তরমুজ খেলে শরীরে ভিটামিন

'এ'র চাহিদা পূরণ হয়। তরমুজ খেলে ত্বক উজ্জ্বল ও সুস্থ থাকে। কারণ ভিটামিন এ ত্বককে ইনফেকশন থেকে রক্ষা করে। তরমুজে ভিটামিন বি-৬, ভিটামিন বি-১ শরীরে এনার্জি তৈরিতে সাহায্য করে। এর ভিটামিন সি কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। প্রতিদিন দুই কাপ পরিমাণ তরমুজ খেলে শরীরে ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি'র চাহিদা মেটে। তরমুজে আরো আছে পটাশিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও কমায়। পটাশিয়াম শরীরে ফ্লুইড ও মিনারেলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ২ কাপ তরমুজে ৩৫০ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পাওয়া যায়।

আনারস

আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। বাংলাদেশের অনেক স্থানেই আনারস চাষ করা হয় তবে সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল জেলায় প্রচুর পরিমাণে আনারস চাষ হয়। মোট ৪৫,৬৮৫ হেক্টর জমিতে বছরে উৎপন্ন হয় প্রায় ২,৩৪,৮৬৫ মেট্রিক টন আনারস। সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে আনারস গাছে ফুল আসে। আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসলও বটে। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। এই সকল উপাদান আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আনারস ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ এতে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। এ ফলের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাংগানিজ। প্রতিদিনের খাবার তালিকায় পরিমিত পরিমাণে আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যাজনিত যে-কোনো রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ ফলের ক্যালসিয়াম দাঁতের সুরক্ষায় কাজ করে। মাড়ির যে-কোনো সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, আনারস ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই রোগটি আমাদের চোখের রেটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাই। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন। প্রতিদিন আনারস খেলে এই রোগ হওয়ার আশঙ্কা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের মহামূল্য অঙ্গ চোখ। আনারস হজম শক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকরী।

বাঙ্গি বা ফুটি

গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে বাঙ্গি অন্যতম। বাঙ্গিকে অনেকে ফুটিও বলে। বাঙ্গি ভিটামিন বি ও সি সমৃদ্ধি ফল। গরমে এ ফল আনে সজীবতা। বাঙ্গি পাকলে হলুদ রং ধারণ করে। বাঙ্গিতে রয়েছে পুষ্টি গুণ ও ঔষধি গুণ। জ্বরের সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা কমাতে বাঙ্গির জুস খুবই কার্যকর। পেটের সমস্যা দূর করে বমি নিবারণ করে এবং হজমে সাহায্য করে। বাঙ্গিতে রয়েছে উচ্চ পরিমাণের ভিটামিন সি

এবং বিটা ক্যারোটিন। বিটা ক্যারোটিন ও ভিটামিন সি সংমিশ্রণে শরীরের কাটা ছেড়া দ্রুত শুকায়। এতে চিনির পরিমাণ কম। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বাঙ্গি যথেষ্ট উপকারী। এসিডিটি, আলসার, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামন্দা, নারীদের হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করে বাঙ্গি। পুরষের হাড়কেও করে মজবুত। মনের অবসাদ দূর করার ক্ষমতাও রয়েছে এই ফলের। তরমুজ যেসব এলাকায় জন্মে, বাঙ্গিও সেসব এলাকায় জন্মে। তবে এ ফল বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মে থাকে।

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন ফল ইতোমধ্যেই যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং ওমানে রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানিকৃত এ ফল থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে– যা আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আগামী দিনে, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিংগাপুর, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশি ফল রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখক: কপি রাইটার, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু

কে সি বি তপু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'আজও আশা করে আছি পরিত্রাণ-কর্তা আসবে সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে, চরম আশ্বাসের কথা শোনাবে পূর্ব দিগন্ত থেকেই।' বাঙালির ভাগ্যাকাশে সেই ত্রাণকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে বাঙালির কাছ থেকে ভাষার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু তাদের সেই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বাঙালির ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা তাকে সাংস্কৃতিক-স্বাধিকার-স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী করেছিল। আজীবন মাতৃভাষাপ্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে, ১৯৪৮ সালে রাজপথে আন্দোলন ও কারাবরণ, পরে আইনসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বাংলা ভাষাকে তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর কাছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৬ সালের ১৭ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু সংসদের দৈনন্দিন কার্যসূচি বাংলা ভাষায় মুদ্রণ করার দাবি জানান। ৭ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে তিনি খসড়া শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত জাতীয় ভাষাসংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে। পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবি এই যে, বাংলাও রাষ্ট্রভাষা হোক। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আইনসভার অধিবেশনেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রথম সংবিধানে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংবিধান প্রণীত হয়। এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধান। যে সংবিধানে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, তা ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অফিসের কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে ১৮ই মার্চ ২০১৯ মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের শুরুতে বাংলা ভাষা প্রচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবদান বিষয়ক 'বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

এক কথায় ভাষা আন্দোলন, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারে বঙ্গবন্ধু যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা ইতিহাসে অনন্য এক দৃষ্টান্ত। এসব বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে 'বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গ্রন্থে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৮ই মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা ভাষা আন্দোলন, বাংলার উন্নয়ন ও প্রচারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান নিয়ে রচিত 'বাংলা ভাষার বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এ কে এম মোজাম্মেল হক, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এস এম আরিফ-উর-রহমান ও জার্নি পাবলিকেশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খন্দকার বজলুল হক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জার্নি পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার প্রচারণায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান সচিত্র তথ্যসহ তুলে ধরা হয়েছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

১২ই জুন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

সৈকত নন্দী

প্রতিবছর ১২ই জুন শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮০টি দেশ এ দিবসটি পালন করে। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি পালন করে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম সংস্থা (আইএলও)। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) ১২ই জুনকে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করার পর থেকে প্রতিবছর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। যার মূল উদ্দেশ্য শিশুশ্রম বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ করা।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ থাকলেও বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের অনেক শিশু। রাজধানী ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অমানবিক দৃশ্য চোখে পড়ে প্রতিনিয়ত। যে বয়সে বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বই-খাতা হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই বয়সেই এসব শিশু হাতে তুলে নিয়েছে হাতুড়ি ও ইট। আমাদের উদাসীনতায় মানবাধিকার বঞ্চিত এমন অনেক শিশু জীবন বাঁচানোর তাগিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আইএলও'র সর্বশেষ এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশু নানাভাবে শ্রম বিক্রি করছে। তাদের অর্ধেক প্রায় সাড়ে ৮ কোটি শিশু নানারকম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। 'জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩' অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩৪ লাখ ৫০ হাজার শিশু কোনো না কোনো শ্রমে নিয়োজিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত এ জরিপে দেখা যায়, এর মধ্যে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশুই বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

রাষ্ট্র, সমাজ ও আমাদের সবার দায়িত্ব শিশুদের অধিকার রক্ষা করা। দেশের কয়েক লাখ শিশু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নির্ধারণ করে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের অঙ্গীকার করেছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমজীবী শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে সাধারণ শ্রমে নিযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। শিশুশ্রম বন্ধ করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করতেও নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়ন গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করে তাদেরকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে 'সবার জন্য শিক্ষা'র আওতায় সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ উপবৃত্তি প্রদান এবং দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু রয়েছে।

শিশুশ্রম বন্ধে বাংলাদেশে কাজ করছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থা। সরকার শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, কারা শিশু। এখানে বলা আছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নেওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কাজে নেওয়া যাবে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেওয়া যাবে না।

শিশুশ্রম নীতি, ২০১০ বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে কাজ করছে। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ ঠিক করেছে সরকার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– নীতির প্রয়োগ, শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করে শিশুশ্রম দূর করার জন্য চারটি কমিটি করা হয়েছে। যেমন ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটি; এর প্রধান হলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। বিভাগীয় চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটি রয়েছে; এর প্রধান হলেন বিভাগীয় কমিশনার। জেলা শিশু অধিকার ফোরাম; এর প্রধান জেলা প্রশাসক। উপজেলা চাইল্ড লেবার মনিটরিং কমিটি; এর প্রধান উপজেলা নির্বাহী অফিসার। আইএলও বাংলাদেশ সরকারকে বিভিন্নভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। সরকারের সঙ্গে আইএলও, এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। সবার উদ্দেশ্য শিশুশ্রম নিরসন করা।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য দরকার গণমাধ্যমে এ বিষয়ে বেশি বেশি প্রচার করা। বিভিন্ন ধরনের নাটক ও গানের মাধ্যমে প্রচার চালানো যেতে পারে। দরিদ্র শিশুদের অভিভাবকদের কাজের ব্যবস্থা করা, বেশি করে তদারকির ব্যবস্থা করা, যারা শিশুদের কাজে লাগাবে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা, শিশুশ্রম নিরসনে যেসব আইন আছে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম আছে তবে ধীরে ধীরে কমছে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাদের প্রতিবেদনে তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ শিশুশ্রম নিরসনে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নিয়েছে। এসডিজিতে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা আছে। এলক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে জোরদার করতে হবে। কাজ করার জন্য নীতিমালা ও বিভাগীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত কমিটিকে সক্রিয় ও জোরদার করতে হবে।

শিশুশ্রম নিরসনের মতো এত বড়ো কাজ হয়ত শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক খাতসহ সমাজের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখার জন্য ব্যবসায়ীরা উদ্যোগ নিতে পারেন। শুধু নীতিমালা ও আইন শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। শিশুশ্রম নিরসনে সকল মহলের সচেতনতা ও আন্তরিকতা জরুরি। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করতে হলে সরকারের দিক থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার, বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা এবং সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে শিশুশ্রম নিরসনে ভালো কাজ করেছে। বাংলাদেশের এমন লাখ লাখ শিশু এখন স্কুলে যায়। এসব শিশুর জীবনমানের উন্নয়ন হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করলে ভবিষ্যতে দ্রুতগতিতে বাংলাদেশের শিশুশ্রম নিরসন হবে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে আমাদের প্রত্যাশা– বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত হোক।

লেখক: প্রাবন্ধিক

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

জেসিকা হোসেন

২৬শে জুন, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় দিনটিকে মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এ দিবস উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র, সুভ্যেনির প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া র‍্যালি, অলোচনাসভা, মাদক রোধে গণমাধ্যম ও মুঠো ফোনে মেসেজ পাঠানো হয়।

মাদকদ্রব্য হলো– এমন এক প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক দ্রব্য শরীর বা মনের ওপর নির্ভরশীলতা বা আসক্তি সৃষ্টি করে। এই দ্রব্য কয়েকবার গ্রহণ করার পর বার বার গ্রহণ করতে ইচ্ছে করে। চিকিৎসকরা বলেন, মাদক সেবন বন্ধ করলেই শরীরে নানারকম প্রতিক্রিয়া ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। এর ক্রমাগত গ্রহণে শরীরে এর চাহিদা বাড়তেই থাকে। আমাদের দেশে প্রচলিত মাদক দ্রব্যগুলো হলো– ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবা, আফিম, মরফিন, প্যাথেডিন, টিডিজেসিক ইনজেকশন,গাঁজা, ভাং, মদ, তাড়ি, ঘুমের ঔষধ ইত্যাদি। মাদক থেকে মাদকাসক্তির পরিণাম ভয়াবহ।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ড্রাগ হলো এমন বস্তু যা গ্রহণ করলে ব্যক্তির এক বা একাধিক কার্যকলাপের পরিবর্তন ঘটায়। একটা ড্রাগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার রাসায়নিক গঠন বৈশিষ্ট্যের ওপর।

এ ড্রাগ অপব্যবহারের কারণে রোগী তার রোগের জন্য ওষুধের গুণাগুণ পাওয়ার বদলে পায় বিষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ অপব্যবহারের মাধ্যমে মাদকাসক্তির সূচনা হয়। অপব্যবহার থেকে অভ্যাস। অভ্যাস থেকে আসক্তি।

মাদকাসক্তির প্রধান শিকার তরুণ ও যুবসমাজ। নেশার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ তরুণশক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে, যা যে-কোনো দেশ ও জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ–মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের দায়িত্বশীল আচরণ, যত্ন, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় অনুশাসন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে পারে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা ও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। বাংলাদেশ সরকার মাদকের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে এ সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আর বর্তমানে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানিয়ে দিতে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার শুরু করেছে। এর মাধ্যমে শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করানো হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকের অবাধ বিস্তার রোধে মাদকবিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি মাদক নিরোধ-শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার সমস্যার সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার এখন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৪০ সালের মধ্যে দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে তামাক শতভাগ নির্মূল করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে মাদকাসক্তিমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য স্ব স্ব অবস্থানে থেকে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

রত্নগর্ভা সম্মাননা পেলেন ৩৫ মা

বারোই মে পালিত হয় বিশ্ব মা দিবস। এদিন ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে রত্নগর্ভা মা-২০১৮ সম্মাননা দেওয়া হয় ৩৫ মাকে। যেসব মায়েদের সন্তান অনেকের চেয়ে একটু বেশিই প্রতিষ্ঠিত এমন রত্নগর্ভাদের ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর সম্মাননা দিয়ে আসছে আজাদ প্রোডাক্টস। সাধারণ ও বিশেষ ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। নিজের মায়ের কথা স্মরণ করে মন্ত্রী বক্তৃতায় বলেন, যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই আমার মা। এই মায়েদের নিয়ে জাতি গর্বিত। সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যাত্রায় তাঁদের অবদান বিশাল।

সংক্ষিপ্ত আলোচনাপর্ব শেষে রত্নগর্ভা মা-২০১৮ সম্মাননাপ্রাপ্ত মায়েদের হাতে একটি করে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। সাধারণ ক্যাটাগরিতে ২৫ জন এবং বিশেষ ক্যাটাগরিতে ১০ জন মা এই সম্মাননা পান।

বিশেষ ক্যাটাগরিতে সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন– গুলনাহার বেগম, তাহেরা খানম, ছালেহা খাতুন, রহিমা খাতুন, আনোয়ারা বেগম, দিলরুবা হক রুমা, তাহমিনা বেগম, রোকেয়া সিদ্দিকী, ডা. পারভীন হাকিম আনোয়ার ও খন্দকার তহুরা।

সাধারণ ক্যাটাগরিতে সম্মানিত ২৫ রত্নগর্ভা হলেন– ফাতেমা ইসলাম শিরীন, রওশনারা বেগম, রহিমা খাতুন, কাজী জাহানারা হোসেন, আপেল রানী সাহা, হামিদা রাজ্জাক, দৌলত আরা বেগম, হোসনে আরা বেগম, মমতা বেগম, বেগম সালেহা হক, আয়েশা খাতুন, নূরুননেছা, আফিয়া সোলায়মান, ফজিলাতুন্নেসা, রোমেলি বড়ুয়া, রাবিয়া আলম, মনোয়ারা বেগম, সেলিন ডি কস্তা, জোহরা আককাজ, রোকেয়া বেগম, জোবাইদা হক, মেহেরুন্নেছা, নির্মলা রাণী রায়, রিজিয়া কামাল ও সুফিয়া খাতুন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

নৌকার মাঝি

বাবুল তালুকদার

নৌকার মাঝি পাল তুলে দাপিয়ে বেড়ায়
নদী এপার থেকে ওপারে
সাগর মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে,
মানবসেবার কাজে ব্যস্ত থাকে নৌকার মাঝি
মানবতার হাত বাড়িয়ে দেয় বিপদে-আপদে
যুগ যুগ বহুযুগ মানবতার হাল ধরে বেঁচে আছে,
বেঁচে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী।
পাল তোলা নৌকা জীবনের একমাত্র ভরসা
রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে প্রকৃতির আলো ছায়ায় বেঁচে আছে।
কারো চোখে ওরা বিষকাঁটা,
কারো চোখে ওরা সভ্যতার আলোর ঝলক,
ওরা প্রকৃতির সাথে কথা বলে দিন-রাত
পাখির কণ্ঠের মতো সুর ও ছন্দে গান গায়।
নদীর গর্জন শুনে ভয় পায়নি কোনোদিন
নদী ও সমুদ্র ওদের একমাত্র ভরসা
চিরকাল কেটে যায় দিন
নদী ও সমুদ্রে।
সৃষ্টিকর্তার আদেশ ওদের বাঁচিয়ে রাখে
শুধু অমানুষের দল ওদের
চিনতে পারেনি আজও।

সুরের গাথা বিপ্লবী যাত্রী

শিল্পী মণ্ডল

মৃদুমন্দ গতির মুখখানি,
কারা যাচ্ছে নিত্যযাত্রী।
তাদের অলৌকিক এক কল্পনারে,
ঘিরিছে আমার চারধারে।
বেজে ওঠে,
আপনার কণ্ঠে, চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনের সুরের ধারা
তারা যেন, আমার জীবনের গতিহারা।
আমি দেখি, আমি ভাবি, ক্ষণে ক্ষণে,
এই বুঝি এল তারা, আমার জীবনে।
কারা সেই পথচারী,
আমার প্রতিভায়, ঘিরিছে দিবারাত্রি।
জুগিয়েছে দান, দিয়েছে নতুন প্রাণ,
তাদের প্রেরণায়, পেয়েছে তারা স্থান।
আমি চিনি না, আমি জানি না
তবুও তারা যে, আমার সাধনা।
তারা যেন নতুন সৃষ্টির এক চেতনা
এ মনের তারা যে, এক যাতনা।
তাদের পটলচেরা আঁখি,
মনে হয় যেন ধরে রাখি।

কপালে কালো টিপ

শাহনাজ

দেখা হতেই কেমন চমৎকার উঠে যাবে
দক্ষিণ হাত, ঠেকাবে কপাল বরাবর
তোমাদের বড়ো শ্রদ্ধা করে মেয়েটি।
আদৌ কি আমরা কেউ কাউকে ভালোবাসি
নাকি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কাছে আসা
দূরে যাওয়ার খেলায় মাতি?
সায়াহ্নের ঝড়-জলে আকণ্ঠ ডুবে যেতে যেতে
করুণাধারা বর্ষণ কর হে নিধুর দরদি।

আমার মাননীয়া

শফিকুর রহমান চৌধুরী

বাংলার গণ মানুষের তৃতীয়বারে গণ রায়,
আবারো এগিয়ে দিল ফোর্বস পরিসংখ্যানে মাননীয়া শেখ হাসিনার মান।
ফোর্বসের পরিসংখ্যানে ১০০ জন প্রভাবশালী নারীর মধ্যে
২০১৬ সালের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও
আমার মাননীয়া শেখ হাসিনা তখনো বিশ্বের প্রভাবশালী নারীর মর্যাদায় ৩৬।
ফোর্বসের পরিসংখ্যানে ১০০ জন প্রভাবশালী নারীর মধ্যে
২০১৭ সালের সকল বৈশ্বিক মোকাবিলার প্রেক্ষিতেও
আমার মাননীয়া শেখ হাসিনা এগিয়ে বিশ্বের প্রভাবশালী নারীর মর্যাদায় ৩০।
ফোর্বসের পরিসংখ্যানে ১০০ জন প্রভাবশালী নারীর মধ্যে
২০১৮ সালের বিশ্বে মানুষের আস্থায় ও ভালোবাসায়
আমার মাননীয়া শেখ হাসিনা এবার বিশ্বের প্রভাবশালী নারীর মর্যাদায় ২৬।
তিনি দিয়েছেন দুই হাজার একর জমি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের
যা বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্টি করেছে এক অনবদ্য মানবতার নজির।
আমার মাননীয়া শেখ হাসিনা আছেন ও থাকবেন মাদার অব হিউম্যানিটি
বাংলাদেশের মতোই বিশ্বের সকল শরণার্থী দেশ চায়–
প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমারের অনুকূল প্রতিফলন।

ঈদ আঁকে অবদান

বাতেন বাহার

ঈদ কারো আসে নায়ে, কারো রেলে চড়িয়া
কারো ঈদ আসে ঘরে–পাড়ি দিয়ে দরিয়া।
ঈদ কারো পায়ে হেঁটে–কারো আসে লঞ্চে
কারো ঈদ আসে শুধু বক্তৃতা মঞ্চে।
কারো ঈদ প্লেনে আসে–কারো ঠেলাগাড়িতে
কারো ঈদ সেজে আসে মনকাড়া বাড়িতে।
ঈদ কারো হাসি ভরা, কারো চাপা কান্নার
কারণটা স্বাভাবিক... নেই কিছু রান্নার।
তবু ঈদ নিয়ে আসে শান্তি ও স্বস্তি
প্রাসাদের পাশাপাশি নেচে ওঠে বস্তি।
ধনী আর গরিবের কমে যায় ব্যবধান
ঈদগার কোলজুড়ে ঈদ আঁকে অবদান।

বিষাদে, বিরহে

তাহমিনা বেগম

বুক ভরে দুঃখের মেঘে
অনন্ত বিষাদ ঋতু আকাশে
কেন ব্যথিত হই বিষাদে, বিরহে
কেন হাহাকার ওঠে মেঘে পত্রপল্লবে দূর্বাঘাসে।
এত যে দুঃখ এত যে ভালোবাসা
তার কিছু স্পর্শ পেয়েছে কবিতা
প্রিয় মুখ মিশে যায় আকাশের নীলে
দীর্ঘ শোকাচ্ছন্ন দেবদারু গাছের মতন।
দিনমান শূন্য পথ চেয়ে দুচোখ ঝাপসা হয়
সব শুধু ফাঁকা নৈঃশব্দের বাঁশি বাজে
বিষণ্ন চোখ ম্লান হয়ে যায় শোকে
তবু বার বার ব্যথিত হাত পাতি জীবনের কাছে।
কে দেবে অনন্ত ছায়া। সবখানে খরতাপ
সবখানে দগ্ধ পোড়ামাটি
একবারো আলোকিত প্রত্যুষ দেখি না
শুধু অন্তহীন গ্রীষ্মের দুপুর, হাহাকার
আমার ভিতরে শুধুই অগ্নুৎপাত।

ঈদের দিন

গোলাম নবী পান্না

রোজার শেষে মাস ফুরোলে
ঈদের দিনটি আসে,
সেই খুশিতে দূর আকাশে
চাঁদটি দেখি হাসে।
সে কি খুশি আলোর ঝলক
এই পৃথিবীর বুকে
ঠাঁই নিয়ে নেয় সব মানুষের
সমান্তরাল সুখে।
ঈদের দিনটি ছাড়া এমন
খুশিই জমে না যে
সবার মাঝে বয়ে বেড়ায়
আরতো দমে না যে।

পুনরায় আহ্বান

আউয়াল রণী

কতদিন তোমার সাথে হয়নি কথা
কত কথা জমে আছে হয়ে ব্যথা
সে ব্যথার যন্ত্রণায়
ভাষা ফোটায় ব্যথায়।
তুমি যদি থাকতে পাশে
শুনতে সেই বর্ণনায়
না পাওয়ার কত যে বিবরণ
যদি করতে সেই চিত্র বরণ
মায়ামন্ত্রের পৃথিবী
মায়াচিত্রে আঁকা ছবি
যে ছবির চিত্র দিয়েছ অজান্তে
তা বরণ করেছি মনের অজান্তে
ভালোলাগা ভালোবাসার
দেনা পাওনার হিসাব হয়েছে
মায়ার জালে জড়িয়ে
কখন যে কি হয়েছে
সেই থেকে কি যে হলো
খাঁচা থেকে মনটা উড়লো।

তুমি আমার ঈদের চাঁদ

রুস্তম আলী

তুমি আমার পৃথিবী– সবটুকু ভালোবাসা
তুমি আমার নিরাশায় আশা– সাগরে ভাসা ভেলা।
তুমি আমার ফুলের বাগান– সাজানো বাসর ঘর।
তুমি আমার সাগরের ঢেউ– বাতাসে ইথর।
তুমি আমার বটের ছায়া– রাতের তারা।
তমি আমার স্বাধীনতা– একুশে সকাল বেলা।
তুমি আমার নীল আকাশ– আমি সবুজ ঘাস।
তুমি আমার স্বপ্ন- বেঁচে থাকা নিশ্বাস।
তুমি আমার পিপাসায় জল– শীতের সকাল
তুমি ছাড়া এ পৃথিবীর সবই হাহাকার।
তুমি আমার শ্রাবণের রাত – শীতের পায়েস।
তুমি আমার পাবর্তী– আমি দেবদাস।
তুমি আমার নয়নের আলো– অন্ধের যষ্টি।
তুমি আমি একটি প্রাণ– আল্লাহর সৃষ্টি।
তুমি আমার পূর্ণিমার রাত
জনম জনমে ঈদের চাঁদ।

একটি বছর ঘুরে

আমিনুল ইসলাম কাইয়ূম

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
একটি বছর ঘুরে
আজকে সবাই হিংসা-বিদ্বেষ
ঠেলে দেব দূরে।
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
আনন্দে বুক ভরি
ঘুরে বেড়াই খুশি মনে
ভাসিয়ে সুখের তরি
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
নতুন বার্তা নিয়ে
সাহায্য করি দীন-দুঃখীদের
অর্থ কড়ি দিয়ে
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
ভেদাভেদ ভুলে যাই
মানবতার সমাধান থেকে
এটাই শিক্ষা পাই
ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
ঝামেলা ঝেড়ে ফেলি
কাইয়ূম কবি সুখে কয়
খাদ্যে ভরেছে বেলি।

বৃষ্টিবিলাস

ওয়াসীম হক

সুখে থাকো আমার শহর নকশিকাঁথায় মুড়ে
যন্ত্রণা থাক লুকোছাপায় কষ্ট শরীরজুড়ে,
কেউ দেখ না মানসপটে উলটো পিঠের ছবি
খাতায় শুধু সুখই এঁকো নগর মানস কবি।
চায়ের কাপে আমেজ নিয়ে ব্যালকনিতে তুমি
ভেজা শহর গাছের সবুজ ভেজা পটভূমি,
ফুটপাতের ওই পলিথিনে ছিদ্রগুলো গোনা
কী দরকারি মন খারাপের কাব্য তোমার শোনা।
সুখী মানুষ এসো তবে পদ্যে ভেজাই পাতা
বৃষ্টিবিলাস জটিল ভারী দিয়ে মাথায় ছাতা।

বাবা তোমাকে মনে পড়ে

মিতা

বাবা তোমাকে মনে পড়ে
প্রতি ক্ষণে প্রতি মুর্হূতে
তোমার স্নেহ, মমতা আর ভালোবাসা মাখা
কথাগুলো আমি খুব মিস করি
তোমার শাসন-বারণ মাখা কথাগুলো
আমাকে শিক্ষা দিয়েছে বড়ো হবার
কিন্তু আমার বড়োত্ব বা ব্যস্ততা
কোনো কিছুই তোমাকে
ভুলিয়ে রাখতে পারিনি
মনে পড়ে প্রতি ক্ষণে প্রতি মুর্হূতে
তুমি আমার কাছে আজও
জীবন্ত এক মহাপুরুষ।

আমি হতে চাই বাবার মতো

নিহাল হোসেন খান

প্রাণভরে শুনছি আমি
জেমসের 'বাবা' গানটা,
যতই শুনি ততই জুড়ায়
আমার দেহের প্রাণটা।
ভালোবাসি বাবা তোমায়
খুব যে ভালোবাসি,
সব চাইতে ভালোবাসি–
তোমার মুখের হাসি।
বাবা তোমার মনটা যে খুব
উদারতায় ভরপুর;
তোমার মাঝে শুনি আমি
পবিত্র এক সুর।
আমি হতে চাই বাবার মতো
ভালো একজন মানুষ;
হে দয়াময় করো আমায়–
বাবার মতো মানুষ।

শব্দহীন বাক্যে

মোহাম্মদ হোসেন

আজ তুমি আর আমি
বসি মুখোমুখি
শব্দহীন দুই মানব-মানবী
শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দে
সব বলা হয়ে যায়।
আজ তুমি আর আমি
বসি মুখোমুখি
কারো কাছে নেই কোনো অভিযোগ
নেই কোনো চাওয়া-পাওয়া
আছে শুধু স্মৃতিটুকু
যা তোমাকে পাওয়ায়
একান্ত আমার করে।

পরিচয়

রবিউল ইসলাম

আমার একটি ভাষা আছে
এর নাম বাংলা,
আমার একটি দেশ আছে
এর নাম বাংলাদেশ,
আমার একটি জাত আছে
এর নাম বাঙালি,
আমার একটি ধর্ম আছে
এর নাম মানবতা,
আমার একটি মন আছে
এর নাম চেতনা,
আমার একটি গল্প আছে
এর নাম মুক্তিযুদ্ধ,
আমার একটি স্বপ্ন আছে
এর নাম অসাম্প্রদায়িক,
আমার একটি কবিতা আছে
এর নাম স্বাধীনতা,
আমার একটি গুণ আছে
এর নাম প্রগতি,
আমার একটি নেতা আছে
এর নাম মুজিব।

অস্তিত্বের লড়াই

রবিউল ইসলাম রবি

তুই জানিস খুকি, অফিসের বড়ো স্যারের কথা কতটা ধারাল!
মাঝে মাঝে আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়!
আমার অপরাধ আমি অফিসে লেট করি, আমি কী ইচ্ছে করে করি বল!
অফিস শেষে টিউশনি করে মাঝরাতে বাসায় ফিরে দেখি তোরা সবাই ঘুমে নিমগ্ন।
আমি টেবিলে রাখা ভাতের প্লেটে হাত রাখি আর ভাবি, এই তো আর কটা দিন!
সকালে ঘুমটা কিছুতেই ভাঙতে চায় না, তবুও উঠে পরি আমি বাবা বলে!
তোর জন্মদিনে আমার মাইনে হয়নি বলে,
হাতঘড়িটা বিক্রি করে তো জন্মদিনের কেক কিনেছিলাম
ওসব বোধ হয় এখন আর তোর চোখে পড়ে না!
তুইতো বড়ো হয়ে গেছিস মা
এখন আর বাবার হাত ধরে হাটা হয় না বলে দেখাও হয় না!!
জানিস খুকি, সেদিন তোরা যে রেস্তোরায় হৈ হৈ করছিলি
ঐ যে নয় নম্বর টেবিলে বসলি,
আমার ডিউটি ছিল ঐ টেবিলে, মুখে মাস্ক পড়া লোকটি
যাকে বিশ টাকা বকশিশ দেয়া হয়েছিল সে ছিল তোর বাবা!
প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার ওখানে আমি সার্ভ করি
ওরা দুই হাজার টাকা দেয়, সেটা তোর স্কুলের মাইনে!
ঐ যে গতকাল যে রিকশায় করে তুই মিরপুর থেকে ফার্মগেটে গেলি
সে রিকশার চালক কে ছিল জানিস খুকি? তোর হতভাগ্য বাবা!
আজ মনের অজান্তে এসব কেন বলছি জানিস?
যে ছেলেটার হাত ধরে তুই বসেছিলি সে হাত নিরাপদ নয়, খুকি!
ঐ হাতে আমি... দেখেছি, দেখেছি একাধিক নারীর হাত ধরতে!
ঐ হাতের চরও আমি খেয়েছি মা! কারণ ভাড়া কম দিয়েছিল
একদিন আর আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম বলে!
গতকাল ঐ হাতে তোর হাত দেখে আমি যে কতটা অসহায় হয়েছি
তা আমি কাউকে বলতে পারিনি!
দোষ আমার, তোদের ভালো রাখতে গিয়ে
নিজেই ভালো থাকার সুতোটা ছিড়ে ফেলেছি!
এখন, আমার অশ্রু কি তোকে ছোঁবে মা!

ছোটোবেলার স্মৃতি

মো. সবুজ খান

যখন আমি খোকা ছিলাম
ছিলাম ভালো বেশ।
খোকা হয়েই বাবার কাছে
বায়না ছিল অশেষ।
লাগবে ঘুড়ি নাটাই সুতো
লুডো খেলনা গাড়ি।
সবুজ-জামা দিতেই হবে
নইলে করব আড়ি।
ছোটোবেলার সেদিনগুলো
আসবে না আর ফিরে।
তাইতো এখন স্বপ্ন দেখি
সেসব স্মৃতি ঘিরে।

সবার জন্য ঈদ

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

সনেট ও নোভেল দুই ভাই। ওদের বাবা সরকারি চাকুরে। কিছুদিন হলো ওদের বাবা ঢাকা জেলা শহর থেকে বদলি হয়ে মফস্বল শহরে এসেছে। অফিসের কাছেই কোয়ার্টার। দুই ভাই কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে নতুন শহরকে নতুনভাবে দেখে। মফস্বল শহরে কিছুটা শহুরে ছোঁয়াও থাকে আবার কিছুটা গ্রামীণ পটভূমিও দেখা যায়। ঢাকায় থাকতে দুই ভাইয়ের কখনো পুকুর চোখে পড়েনি। কিন্তু এই বনপুর শহরে কোয়ার্টারের সামনেই আছে একটি পুকুর। সনেট ও নোভেল বাবাকে বলে, বাবা আমাদের সাঁতার শিখিয়ে দাও। আমরা পুকুরে গোসল করতে পারব।

বাবা বলে, মাত্রতো আসা হলো। আর কটা দিন যাক। তারপর সবকিছু হবে। সাঁতার শেখা হবে, স্কুলে ভর্তি করানো হবে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে পরিচয় হবে।

সনেট ও নোভেলকে বাবা বনপুর শহরের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। প্রাইমারি স্কুলটি অনেক পুরোনো এবং পড়াশুনার বেশ নামডাক আছে। প্রতিবছর স্কুলটি থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী টেলেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি পেয়ে থাকে।

সনেট ক্লাস ফাইভে এবং নোভেল ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েই তারা অনেক বন্ধু জুটিয়ে ফেলে। এর কারণ হলো দুই ভাই-ই ছিল খুব শান্তশিষ্ট এবং মিশুক স্বভাবের। গরিব-বড়োলোক সবার সঙ্গেই তারা মিশতে পারত।

স্কুলে এসেই তাদের নতুন বন্ধু হয় দুই ভাই রাজিব ও সজীব। তারপর আছে সোহেল, সুমন্ত, অর্ণব, পাভেল, হিমেল আরো কত!

দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে যায় সনেটরা বনপুরে এসেছে। সনেটদের কোয়ার্টারের পিছনেই ছিল বনপুর বস্তি এলাকা। গরিব-দুঃখী অল্প আয়ে যারা চলে, তারা সেই বস্তিতে থাকত। সনেট আর নোভেলদের বন্ধু রাজিব আর সজীবও সেই বস্তিতে থাকত। তাদের বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করত আর মা একটি স্কুলে ঝিয়ের কাজ করত। রাজিব আর সজীব দুজনেই মেধাবী। তাই দুই মেধাবীর সঙ্গে সনেট-নোভেল দুই মেধাবীর বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রাজিব একদিন দুঃখ করে বলে, আমার বাবা-মা অনেক কষ্ট করে আমাদের পড়াচ্ছে। তাদের ইচ্ছা আমরা যেন বড়ো হয়ে

তাদের দুঃখ ঘোচাতে পারি।

সনেট তখন বলে, অবশ্যই পারবে। মন দিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাও। মা-বাবার দোয়া নিও। তাহলেই একদিন সফল হবে। আমার বাবা বলেছে, মা-বাবার দোয়া কখনো বৃথা যায় না। নিশ্চয়ই তোমার বাবা-মা তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমরা লেখাপড়া করে অনেক বড়ো হবে।

রাজিব: তাতো করেই। তারপরও বাবা-মার জন্য দুঃখ হয়। তারা কত পরিশ্রম করে!

সনেট: তারা যে পরিশ্রম করছে– সেটা মনে রেখেই তোমরা দুই ভাই পড়। তাহলেই সাকসেস হবে।

দুই বন্ধু কথা বলা শেষে যার যার বাড়িতে চলে যায়।

কিছুদিন পর স্কুলের মাঠে খেলা হবে। সবাইকে চাঁদা দিতে হবে। রাজিব আর সজীব চাঁদা দিতে পারছে না। তাই তাদের খেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়। পরদিন সনেটের সঙ্গে রাজিব আর সজীবের দেখা হয় বাড়ির পাশে। সনেট বলে, কি রাজিব কালকে খেলতে যাবে না?

রাজিব চুপ করে থাকে। আর সজীব বলে, আমাদের খেলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সনেট: কেন?

সজীব: খেলার চাঁদা দিতে পারিনি বলে।

সনেট: তাই বলে খেলা থেকে বাদ দিতে হবে? দাঁড়াও আমি দেখছি।

সনেট ঘরে ঢুকে নিজের মাটির ব্যাংকটি ভেঙে ফেলে। দেখে, প্রায় একশ'র মতো টাকা জমা হয়েছে। সেখান থেকে ৫০ টাকা নিয়ে ফিরে আসে।

ঘরের বাইরে এসে বলে, একজনের ২৫ টাকা করে চাঁদা ধরা হয়েছে। তোমাদের দুজনের ৫০ টাকা লাগবে। নাও, এই টাকাটা কালকে ক্রীড়া শিক্ষক সাইফুল স্যারের কাছে জমা দিয়ে দিও।

রাজিব ও সজীব প্রথমে টাকাটা নিতে চায় না। অনেক বলার পর তারা সনেটের কাছ থেকে টাকাটি নেয়।

এভাবে সনেট তার দুই বন্ধু রাজিব ও সজীবকে খেলতে সুযোগ করে দেয়।

রমজান মাস আগত। আর কদিন পরেই ঈদের ছুটি হয়ে যাবে। তাই ছাত্রছাত্রীরা বেশ খুশি। পড়ার চাপ থাকবে না। খেলাধুলা করা যাবে। ঈদের সপ্তাহখানিক আগেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে আসে। সনেট আর নোভেলও বাড়ি ফিরছে আনন্দ করতে করতে। হঠাৎ সনেটের মনে হলো– রাজিব আর সজীব কোথায়? কারণ ওরাতো এই রাস্তা দিয়েই বাড়ি যায়। সনেটদের কোয়ার্টারের পিছনেই রাজিবদের বস্তি বাড়ি।

নোভেলই প্রথম দেখতে পেয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে সনেটকে দেখায়, দেখ ভাইয়া রাজিব আর সজীব ঐদিক দিয়ে যাচ্ছে। তারা দুই ভাই রাজিব-সজীব বলতে বলতে তাদের কাছে চলে আসে।

সনেট বলে: কি রে ঈদের ছুটি হলো? সবাই আনন্দ করতে করতে বাড়ি যাচ্ছে। আর তোমরা দুই ভাই মনমরা হয়ে অন্যদিক দিয়ে বাড়ি যাচ্ছ কেন?

রাজিব আর সজীব প্রথমে কিছু বলতে চায় না।

রাজিব: না, কিছু হয়নি।

সনেট: একটাতো কিছু হয়েছেই। তা না হলে তোমাদের মন খারাপ কেন?

সজীবই প্রথমে মুখ খুলে।

সজীব: না মানে। আমার বাবারতো কয়েক দিন যাবত কোনো কাজ নাই। তার হাত নাকি একদম খালি। আমরা ঈদের জামা চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা দেয়নি। বলেছে, কাজ পেলে ঈদের জামা কিনে দিবে।

সনেট: চাচা তো ঠিকই বলেছে। দেখিস কালকেই জমির চাচা একটা কাজ পেয়ে যাবে। আর তোমাদের ঈদের জামাও কিনে দিবে।

রাজিব: আমাদের মায়েরও অসুখ। স্কুলে কাজ করতে যেতে পারছে না। তাই তার বেতনও পায়নি। তা না হলে মা-ই আমাদের নতুন জামা কিনে দিত।

নোভেল: তাই বলে মন খারাপ করতে হবে? আজকে না পাও, কালকে জামা পাবে। এভাবে দুই ভাই রাজিব আর সজীবকে বুঝিয়ে তাদের বাড়ি দিয়ে আসে। তারপর নিজেরা বাড়ি চলে আসে।

সনেটের বাবা তাঁর অফিস ছুটি হবার পর সময় করে একদিন সনেট আর নোভেলকে নিয়ে ঢাকা চলে আসে। সেখানে একটি শপিংমল থেকে দুই ভাইয়ের জন্য দুই সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি ও দুই সেট শার্ট-প্যান্ট কিনে। সনেট বলে, বাবা তোমার জন্য কিছু কিনলে না? মায়ের জন্য কিছু কিনলে না?

বাবা: তোমার মা-তো নিজের পছন্দ ছাড়া শাড়ি কিনতে চায় না।

সনেট: তারপরও ঈদ উপলক্ষে একটা কিনে নাও।

বাবা মায়ের জন্য সেই শপিং মল থেকেই একটি শাড়ি ও নিজের জন্য একটি পাঞ্জাবি কিনে। তারপর তারা আবার বনপুর কোয়ার্টারে চলে আসে।

বাড়িতে এসে সনেট মাকে শাড়িটি দেখিয়ে বলে, দেখতো মা তোমার এই শাড়ি পছন্দ হয়েছে কিনা। আমি আর নোভেল পছন্দ করেছি এই নীল শাড়িটি।

মা রেগে বলে, বেশি পাকামো হচ্ছে!

খিল খিল করে দুই ভাই তখন হেসে ওঠে।

ঈদের আর একদিন বাকি আছে। ঈদের আগের দিন বিকেলে স্কুলের মাঠে সবাই এসেছে ঈদের চাঁদ দেখতে। স্কুলের মাঠটি বেশ খোলামেলা ছিল। চারদিকে তেমন কোনো উচ্চতর বিল্ডিং না থাকায় ঈদের চাঁদ বেশ ভালোভাবেই সেখান থেকে দেখা যায়। তাই সে এলাকার লোকজন সেই স্কুলের মাঠেই এসে জমায়েত হতো ঈদের চাঁদ দেখতে।

সনেট আর নোভেলও ঈদের চাঁদ দেখতে স্কুলের মাঠে চলে আসে। সেখানে এসে অনেক লোকের মাঝে তাদের বন্ধু সোহেল, সুমন্ত, অর্ণব, পাভেল ও হিমেলকে দেখতে পায়। সবাই তখন মজা করে ঈদের চাঁদ দেখে! হঠাৎ সনেটের মনে হলো, রাজিব আর সজীব ওরা এল না কেন? এতবড়ো একটা আনন্দের মাঝে ওরা নেই! সনেটের মনটি খারাপ হয়ে যায়। রাজিবদের বাড়ি সনেট যেতে চায়। কিন্তু এরই মাঝে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। রাজিবদের বাড়ির ওদিকে অন্ধকার। তাই আর সনেটের যাওয়া হলো না।

বাড়ি এসে সনেট আর নোভেল বাবাকে বলে, জানো বাবা আমাদের সব বন্ধুরা ঈদের চাঁদ দেখতে এসেছে। শুধু রাজিব আর সজীব আসেনি।

বাবা তখন বলে, আচ্ছা আমি ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। বাবা আর ছেলেদের কথা বলার সময় একটি লোক তাদের বাড়িতে আসে। লোকটি সনেটের বাবাকে জিজ্ঞেস করে, আপনিইতো রায়হান সোবহান?

সনেটের বাবা বলে, জ্বি আমিই।

লোকটি তখন বলে, আমি আমেরিকায় থাকি। এবারের ঈদে দেশে এসেছি। আমার বাড়ি এই বনপুরেই। আপনার বোন বিউটি আপা আমেরিকাতে আমাদের এলাকাতেই থাকে। উনি আপনাদের জন্য একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে। অনেক খুঁজে আমি আপনাদের কোয়ার্টারটি বের করেছি।

লোকটি তার হাতের প্যাকেটটি সনেটের বাবার হাতে তুলে দেয়।

সনেটের বাবা লোকটির অনেক প্রশংসা করে বলে, আমাদের জন্য আপনার অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

লোকটি বলে: না, না। তেমন কিছু হয়নি।

বাবা লোকটিকে কিছু খেতে বলে। কিন্তু তিনি হাতে সময় নেই বলে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান।

সনেটের বাবা প্যাকেটটি খুলে দেখে খুশি হয়ে বলে, এই দেখ তোমাদের বিউটি ফুপি তোমাদের জন্য দুই সেট শার্ট-প্যান্ট পাঠিয়েছে। আমার জন্যও শার্ট-প্যান্ট পাঠিয়েছে। আর তোমাদের মায়ের জন্য পাঠিয়েছে শাড়ি।

সনেট আর নোভেল বিউটি ফুপির দেওয়া জামাকাপড়গুলো খুলে পরে দেখে।

সনেট: বাবা, দেখতো আমাদের কেমন লাগছে ফুপির শার্ট আর প্যান্ট পরে?

বাবা: বা... বা... তোমাদের চমৎকার মানিয়েছে ড্রেসগুলো! এবার শাড়িটাও পরতে বলো তোমাদের মাকে!

সনেট আর নোভেল (সমস্বরে): মা তুমিও শাড়িটা একটু পরো না।

মা ক্ষেপে গিয়ে বলে: তোদের বাবা যা বলছে। তোরা তাই বলছিস। আমি রাতে এই শাড়ি পরে কী করব?

মায়ের কথায় বাবা আর দুই ছেলে হো হো করে হেসে ওঠে।

পরদিন ঈদ। সকালে ঈদগাহে ঈদের নামাজ পড়তে যেতে হবে। তাই দুই ভাই তাড়াতাড়িই রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বিছানায় শুয়ে সনেট আর নোভেলের কেন যেন ঘুম আসছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল রাজিব আর সজীবের কথা। নোভেল বিছানায় শুয়েই সনেটকে বলে, ভাইয়া ওরা কেন ঈদের চাঁদ দেখতে এলো না? কি হয়েছে ওদের?

সনেট বলে, আমিওতো ওদের কথাই ভাবছি। রাজিব আর সজীবের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন ছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে বলে পারলাম না। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দুই ভাই ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন খুব সকালে দুই ভাই ঘুম থেকে জাগে। গোসল করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বাবার সাথে ঈদগাহে যায় নামাজ পড়তে।

নামাজ শেষে বাবা আর দুইভাই একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদ মোবারক বিনিময় করে। তারপর তারা বাড়ি ফিরে। পথে রাজিব আর সজীবের বাবার সঙ্গে দেখা হয়। রাজিব-সজীবের বাবাকে সনেটের বাবা চিনত। সে তাদের কোয়ার্টারের একটি রুম তৈরিতে কাজ করেছিল।

সনেটের বাবা বলে, কি জমিরউদ্দীন, তোমার খবর কী? তোমার ছেলেরা কই?

জমিরউদ্দীন: মিয়া ভাই, আর কইয়েন না। এই রোজার মাসে আমি একদিনও কাজ পাই নাই। হাতে তেমন টাকা নাই। অগ মায়েরও অসুখ। তাই স্কুলে যাইতে পারে না বইল্যা বেতন আনতে পারে নাই। আমি কেমনে অগ নতুন জামা দিমু? এই নতুন জামা কাপড় দেই নাই দেইখ্যা রাজিব আর সজীব ঈদের নামাজ পড়তে আসে নাই।

আচ্ছা আমি ওদের রাগ ভাঙিয়ে দিব বলে, বাবা দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়ি চলে আসে।

বাড়িতে এসে বাবা বলে– দেখলে তোমাদের বন্ধুরা ঈদের পোশাক পায়নি বলে নামাজ পড়তে আসেনি।

সনেট: তা তো শুনতে পেলাম। কিন্তু কী করা যায়?

নোভেল এসে মায়ের কাছে বলে, দেখ মা রাজিব আর সজীব আজ আমাদের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে আসেনি।

মা: কেন?

নোভেল: ওদের বাবা ওদের নতুন জামা কাপড় কিনে দেয়নি বলে।

মা: তা আমার কী করতে হবে?

নোভেল: আচ্ছা মা, আমাদেরতো দুই সেট পোশাক আছে। তার থেকে যদি ওদেরকে একসেট করে দিয়ে দিই।

মা: আমি ওসব জানি নে।

সনেট জানে মাকে ওসব কথা বলে কাজ হবে না। তাই সে বাবাকেই বলে।

সনেট: বাবা আমাদেরতো তুমি একসেট পোশাক দিয়েছ। আবার বিউটি ফুপিও একসেট পোশাক দিয়েছে। আমাদের দুই সেট জামা-কাপড় হয়েছে। আর রাজিব-সজীবের একসেটও নেই। আমি আর নোভেল কি আমাদের থেকে একসেট করে পোশাক ওদেরকে দিয়ে দিতে পারি না?

বাবা ছেলের উদার মন দেখে মনে মনে খুশি হয়। তারপর বলে, সেটা তোমাদের ইচ্ছা।

সনেট: কেন বাবা তুমিই না বলেছিলে একা আনন্দ-ফুর্তি করার চেয়ে সবাই মিলে আনন্দ-ফুর্তি করাটাতেই বেশি আনন্দ উপভোগ করা যায়।

বাবা: তাহলে চলো, তাদের জামা দিয়ে এসো।

সনেট বাবা তার কথাতে মত দেওয়ায় অনেক খুশি হয়। তারপর সনেট আর নোভেল ঈদের একসেট নতুন পোশাক পরে অপর সেটটি হাতে নিয়ে বলে, বাবা তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে।

বাবা, সনেট আর নোভেল তখন জমিরউদ্দীনের বাড়িতে আসে।

সনেট ডাক দেয়, রাজিব-সজীব বলে। জমিরউদ্দীন ঘর থেকে বের হয়ে আসে। দেখে সনেট, নোভেল আর তাদের বাবা তাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।

জমিরউদ্দীন সনেটের বাবাকে দেখে বলে, মিয়া ভাই আপনে?

সনেটের বাবা: তোমার ছেলেদের ডাকো।

জমিরউদ্দীন: ওরাতো শুইয়া আছে।

সনেটের বাবা: এই দেখ তোমার দুই ছেলের জন্য ওদের দুই বন্ধু নতুন পোশাক নিয়ে এসেছে। ওদের এগুলো পরে আসতে বলো।

জমিরউদ্দীনের চোখে তখন আনন্দাশ্রু দেখা যায়। খুশি হয়ে বলে, মিয়া ভাই আপনার দুই ছেলের মন অনেক বড়ো! ওদের জন্যই আজ আমার আশাডা পূরণ হইল। নাইলে ছেলে দুইডারে কিছুতেই ঘর থাইক্যা বাইর করতে পারতাম না।

এর মাঝে সনেট আর নোভেল রাজিব-সজীবদের ঘরে ঢুকে দুজনের হাতে পোশাক ধরিয়ে দিয়ে বলে, এক্ষুনি এই জামা-কাপড় পরে নাও।

রাজিব আর সজীবও হঠাৎ নতুন জামা পেয়ে যেন খুশিতে আটখানা হয়ে যায়।

তারপর দুই ভাই নতুন জামা পরে সনেট আর নোভেলের সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

সনেটের বাবা বলে, পোশাকগুলোতে ওদের দারুণ মানিয়েছে!

সনেট আর নোভেল রাজিব আর সজীবকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর চারজনে মিলে ঈদের সকালের খাবার সেমাই, পায়েস, জর্দা এগুলো খায়।

খাবার শেষে চারবন্ধু ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুলের মাঠে আসে। দেখে সেখানে অন্য বন্ধুরাও উপস্থিত হয়েছে।

তখন সকল বন্ধুরা আনন্দে মেতে ওঠে। সনেট, নোভেল, রাজিব, সজীব, সোহেল, সুমন্ত, অর্ণব, পাভেল, হিমেল সকলেই একের সঙ্গে অপরে হাত মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে ঘুরতে থাকে।

সনেট তখন বলে, আজ আমাদের এই ঈদের আনন্দটি হচ্ছে সবার জন্য। সবাই একত্রে আনন্দ করতে পারছি।

সনেটের সঙ্গে সবাই একত্রে আনন্দে বলে ওঠে, 'সবার জন্য ঈদ! সবার জন্য ঈদ!'

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৩ই মে ২০১৯ বঙ্গভবনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখুন

বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। রাষ্ট্রপতি বলেন, গৌতম বুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সব ধর্মের মূল বার্তা হচ্ছে মানব কল্যাণ। ১৩ই মে ২০১৯ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বঙ্গভবনে আয়োজিত এক সংবর্ধনায় রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সমাজে সত্য, সুন্দর, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সব ধর্মের লোকের অবদান রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ।

মেহনতির পরিশ্রমেই নিহিত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, মালিকপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। মে দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব বলেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, মে দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, উন্নয়নের শপথ করি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বাণীতে রাষ্ট্রপতি আরো উল্লেখ করেন, শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষই হচ্ছে দেশের উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন 'রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কম খরচে হয়রানিমুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিতের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ কম খরচে হয়রানিমুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। ২৯শে এপ্রিল ২০১৯ র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বাংলাদেশ কমিউনিটি অপথ্যালমোলজিক্যাল সোসাইটির ৭ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ভাষণকালে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রপতি বলেন, অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে হয়রানির শিকার হয়ে রোগীরা যাতে প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া চিকিৎসা পেশাকে অত্যন্ত সন্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করে রাষ্ট্রপতি চিকিৎসকদের প্রতি বলেন, অনুরোধ রাখব আপনারা রোগীদের প্রতি আরো বেশি আন্তরিক ও ব্রতী হোন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চক্ষু চিকিৎসা প্রদানের জন্য চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনা একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় মাধ্যম। এ ধরনের ক্যাম্প পরিচালনায় আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনিটর করতে হবে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, খাদ্যশস্য, ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ। ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ 'জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষির উন্নয়ন অভিযাত্রায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া কৃষি শ্রমিকের অভাবজনিত সংকট নিরসন এবং ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় খরচ কমাতে বিভিন্ন স্তরে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি।

সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। ২৮শে এপ্রিল ২০১৯ 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৯' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি একথা বলেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সংবিধানে সব নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয়লাভকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের আর্থসামাজিক ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, 'রূপকল্প ২০২১' ও '২০৪১' বাস্তবায়নে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে ২০১৯ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪ লেনের মেঘনা ও গোমতী ২য় সেতু, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-এলেঙ্গা মহাসড়কে কোনাবাড়ি ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার, কালিয়াকৈর, দেওহাটা, মির্জাপুর, ঘারিন্দা আন্ডারপাস এবং কড্ডা-১ ও বাইমাইল সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

খুলল দ্বিতীয় মেঘনা ও গোমতী সেতু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে ঢাকা-পঞ্চগড় রুটে স্বল্প বিরতির আন্তঃনগর ট্রেন 'পঞ্চগড় এক্সপ্রেস'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বাঁশি বাজিয়ে সবুজ পতাকা উড়িয়ে পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, এরই মধ্যে আমরা মেট্রোরেল যেমন চালু করতে যাচ্ছি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎচালিত ট্রেন, যা একান্তভাবে পরিবেশবান্ধব সেই বিদ্যুৎচালিত ট্রেনও চালু করব। আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী কোনাবাড়ি ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার, কালিয়াকৈর, দেওহাটা, মির্জাপুর ও ঘারিন্দা আন্ডারপাস এবং জয়দেপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে বাইমাইল সেতুরও উদ্‌বোধন করেন।

সম্মানের সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারবেন। সেটাই আমরা চাই। এ সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সবার মাঝে থাকবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন, যে-কোনো সম্প্রদায়ই নিজেকে কখনো অবহেলিত যেন মনে না করে, সেদিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখি। আর সে দিক থেকে আমি বলব, 'বাংলাদেশ আজ সমগ্র বিশ্বেই একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।'

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে এপ্রিল হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন আদালতের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পায় তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিচারকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এসিড দগ্ধ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী, প্রতিবন্ধী, পাচারকৃত নারী বা শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন ও নানা আর্থসামাজিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মে ২০১৯ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পঞ্চগড়-ঢাকা-পঞ্চগড় রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'পঞ্চগড় এক্সপ্রেস'-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

সবাই সম্মানের সঙ্গে ধর্ম পালন করবে এ দেশে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে মে গণভবনে বদ্ধপূর্ণিমা উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা দেশ থেকে আসা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, সংঘ সদস্য, সংঘপ্রধানদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে যারা বসবাস করেন সবাই যার যার ধর্ম

কারণে বিচার পেতে অক্ষম নাগরিকদের সম্পূর্ণ সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা দেওয়ার কথা বলেন। তিনি আইনগত সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। এছাড়া মেয়েরা যেন বাবার সম্পত্তিতে পুরোপুরি ভাগ পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে সবার প্রতি অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

উন্নয়ন তথ্যপ্রবাহে উদ্ভাবনী হওয়ার আহ্বান

দেশের বিস্ময়কর উন্নয়নে তথ্য জনগণের কাছে আরো কার্যকরভাবে পৌঁছাতে সুচিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগে ব্রতী হতে তথ্য ক্যাডারের অফিসারদের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১৪ই মে কাকরাইলে নবনির্মিত তথ্য ভবন মিলনায়তনে বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশন আয়োজিত ইফতারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, গত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ বদলে গেছে। স্বল্প আয় থেকে মধ্য আয়ের ও খাদ্য ঘাটতি থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছি আমরা। বিস্ময়কর উন্নয়নের

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৪ই মে ২০১৯ তথ্য ভবনে বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

এসব তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছাতে তথ্য ক্যাডারের অফিসারবৃন্দ যে ভূমিকা পালন করছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রবাহের এই কাজকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করে তুলতে আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা সরকারকে সহায়তা করবে বলেন তথ্যমন্ত্রী । তিনি এ সময় তথ্য ক্যাডারের অফিসারদের শূন্যপদ পূরণ ও দ্রুত পদোন্নতির বিষয়গুলো যত্নের সাথে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

তথ্যসচিব আবদুল মালেক তাঁর বক্তৃতায় তথ্য ক্যাডারের অফিসারদের চাকরির বিভিন্ন দিক ও উন্নয়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন।

আলেম-ওলামাদের প্রতি তথ্যমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বান

জঙ্গিবাদ প্রতিহত করতে আলেম-ওলামাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১৩ই মে কাকরাইলে হোটেল রাজমনি ঈশা খাঁয় বাংলাদেশ ইসলামি ফ্রন্টের ইফতার ও আলোচনাসভায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশকে যেমন উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে, তেমনি আলেম-ওলামাদের উন্নয়নেও যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। আর অপরদিকে ইসলামের লেবাসধারী কিছু মানুষ ও গোষ্ঠী ইসলামের বদনাম ছড়াচ্ছে, তরুণদের পথভ্রষ্ট করছে, জঙ্গি প্রশিক্ষণও দিচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের শিক্ষা প্রসঙ্গে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ইসলাম কখনো জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া বা ধর্মের নামে হত্যা সমর্থন করে না। ইসলামের সঠিক চেতনার বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, প্রতি জেলা ও উপজেলায় মসজিদসহ ইসলামি কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ ও ৭০ হাজার মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা ও সেখানে একজন করে সরকারি ভাতাপ্রাপ্ত আলেম নিয়োগ করেছে সরকার, যা আগে কখনো হয়নি।

তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

তথ্য কমিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের ফলক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ২৪শে এপ্রিল শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় তথ্য কমিশন ভবনের জন্য নির্ধারিত এফ-১৭-ডি প্লটে নতুন এ ভবন নির্মাণ কাজ উদ্‌বোধনকালে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী বলেই ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর প্রথম সংসদ অধিবেশনেই 'তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন' ও 'তথ্য কমিশন গঠন' করে। তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩তলা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ দেশের তথ্য খাতে একটি মাইলফলক।

তথ্যমন্ত্রী এ সময় ভবনের আধুনিক মিলনায়তন, সম্মেলন কক্ষসহ অন্যান্য সুবিধা সংবলিত নকশার প্রশংসা করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

পরিবেশ রক্ষা সচেতনতায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনন্য

পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা সচেতনতায় গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অনন্য বলে বর্ণনা করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ২৬শে এপ্রিল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে দু'দিনব্যাপী আয়োজিত এশীয়-প্রশান্ত আঞ্চলিক সম্প্রচার সংগঠন 'এশিয়া-প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন-এবিইউ'-এর পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে সম্মেলনের সমাপনী দিনে তাঁর বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, আমরা নিজেরাই আজ পরিবেশ ধ্বংসের কারণ হয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করছি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও দুর্যোগ প্রশমনে গণমাধ্যম মানুষকে নতুনভাবে সচেতন করতে ভূমিকা নেবে।

সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কাঠমান্ডু মিডিয়া একশন প্লান গৃহীত হয় যা আগামী দুর্যোগ হ্রাস বিশ্বসভার আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এর আগে ২৫শে এপ্রিল তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ নেপালের প্রধানমন্ত্রী খড়্গ প্রসাদ শর্মা অলির সাথে তার দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী কেপি অলি এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় দুই নেতার মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে বাণিজ্য ও গণমাধ্যম খাতে সহযোগিতা, নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে যৌথ সুবিধা গ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে মে ২০১৯ গণভবনে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, এতিম, প্রতিবন্ধী, আলেম-ওলামা, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আহত ব্যক্তিবর্গ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আত্মীয় পরিজনের সাথে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মোনাজাতে অংশ নেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

মহান মে দিবস পালিত

১লা মে: রাজধানীসহ সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে মহান মে দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, উন্নয়নে শপথ করি'

এসএসসির ফল প্রকাশিত

৬ই মে: সারা দেশে একযোগে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের এসএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়

বিশ্ব অ্যাজমা দিবস

৭ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব অ্যাজমা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আধুনিক ও সঠিক চিকিৎসা নিলে অ্যাজমায় মুক্তি মেলে'

বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস

৮ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ভালোবাসা'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

'মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ' প্রতিপাদ্যে জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আপনার সন্তানকে দিতে থ্যালাসেমিয়া থেকে সুরক্ষা, বিয়ের আগে করুন রক্তের ইলেকট্রোফরেসিস পরীক্ষা'

বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

১০ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'পাখি সুরক্ষায় প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করি'

বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপিত

১২ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব মা দিবস'

আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সবার জন্য স্বাস্থ্য: নার্স, নেতৃত্বে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর'।

বিশ্ব পরিবার দিবস

১৫ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিবার দিবস'

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান ১লা মে ২০১৯ শ্রম ভবনের সামনে মহান মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে অংশ নেন–পিআইডি

বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস

১৭ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আপনার রক্তচাপ জানুন'

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপিত

১৮ই মে: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনে উদ্‌যাপন করে 'আর্ন্তজাতিক জাদুঘর দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর: ঐতিহ্যের ভবিষ্যৎ'

বুদ্ধ পূর্ণিমা দিবস উদযাপিত

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' সারা দেশে নানা আয়োজনে উদ্‌যাপিত হয়

মুক্তিযোদ্ধা, আলেম ও এতিমদের সম্মানে প্রধানমন্ত্রীর ইফতার

১৯শে মে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে এতিম, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, আলেম-ওলামা, প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আলেম-ওলামাসহ সবার দোয়া ও সহযোগিতা চান

বিশ্ব পরিমাপ দিবস

২০শে মে : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব পরিমাপ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক মৌলিকভাবে উত্তম'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

স্পন্সর ছাড়াই সৌদিতে বসবাসের সুযোগ

বিদেশি উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী বাড়াতে ৮ই মে সৌদি আরবের শুরা কাউন্সিল 'গ্রিন কার্ড' মডেলের প্রবাসীদের বসবাসের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে। 'ইকামা' নামক নতুন এ পদ্ধতিতে দক্ষতাসম্পন্ন প্রবাসী ও বিনিয়োগকারীরা আবাসনসহ বেশ কিছু সুবিধা পাবেন।

আগের ইকামা পদ্ধতিতে প্রবাসীকে সৌদিতে বসবাস করতে হলে তাকে সৌদি কোনো স্পন্সর বা বিনিয়োগকারীর অধীনে থাকতে হতো। নতুন এই গ্রিন কার্ডের অধীনে স্পন্সর বা বিনিয়োগকারী লাগবে না। একইসঙ্গে ওই প্রবাসী সম্পদ ও পরিবহণের মালিক হতে পারবেন, কর্মী নিয়োগ দিতে পারবেন, বেসরকারি খাতে, বাণিজ্য ও শিল্পে কাজ করতে পারবেন, চলাফেরার স্বাধীনতা পাবেন এবং সৌদি আরব থেকে যখন ইচ্ছা দেশে ফিরতে পারবেন। বিমানবন্দরে মনোনীত সারি ব্যবহার করতে পারবেন।

মিয়ানমার সেনাদের একঘরে করার আহ্বান জাতিসংঘের

যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগে জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক স্বাধীন আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী মিশন মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে 'একঘরে' করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট জানিয়েছে, ১৪ই মে মিয়ানমার বিষয়ক স্বাধীন আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী মিশন (এফএফএম) এ আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় ১০ দিনের সফর শেষে এফএফএমের চেয়ারপারসন এবং ইন্দোনেশিয়ার সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মারজুকি দারুসমান বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে দেওয়া সব ধরনের আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা বন্ধ করে ওই বাহিনীর কমান্ডারদের একঘরে করা প্রয়োজন। মিয়ানমার সংঘাত নিরসনে এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে চলে যাওয়া রোহিঙ্গাসহ সবার মানবাধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়নি বলে এসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

১৫ই মে ২০১৯ নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন করায় সাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করেছে জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিএসটিআই। একইসঙ্গে ১৮টি পণ্য উৎপাদনের অনুমোদন স্থগিত করেছে সংস্থাটি।

লাইসেন্স বাতিল হওয়া কোম্পানিগুলোর তালিকায় ড্রিংকিং ওয়াটারের মধ্যে রয়েছে– আল সাফি ড্রিংকিং ওয়াটার, শাহারী অ্যান্ড ব্রাদার্সের নারজান ড্রিংকিং ওয়াটার, মর্ন ডিউ পিওর ড্রিংকিং ওয়াটার এবং আর আর ডিউ ড্রিংকিং ওয়াটার। কেরানীগঞ্জে শান্তা ফুড প্রডাক্টসের টেস্টি, তানি ও তাসকিয়া এবং কামরাঙ্গীর চরের জাহাঙ্গীর ফুড প্রডাক্টসের প্রিয়া ব্র্যান্ডের সফট ড্রিংক পাউডার, মিরপুরের বনলতা সুইটস অ্যান্ড বেকারির বনলতা ব্র্যান্ডের ঘি। লাইসেন্স স্থগিত হওয়া পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে– সরিষার তেলে সিটি অয়েল মিল-গাজীপুর (তীর), গ্রিন বিসিং ভেজিটেবল অয়েল-নারায়ণগঞ্জ (জিবি), শবনম ভেজিটেবল অয়েল-নারায়ণগঞ্জ (পুষ্টি), বাংলাদেশ এডিবল অয়েল-নারায়ণগঞ্জ (রূপচাঁদা)। আররা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ (আররা), ডানকান প্রডাক্ট (ডানকান), দিঘী ড্রিংকিং ওয়াটার (দিঘি) প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেডের প্রাণ ব্র্যান্ডের লাচ্ছা সেমাই, হলুদের গুঁড়ার মধ্যে ড্যানিশ, প্রাণ ও ফ্রেশ। কারি পাউডারের মধ্যে প্রাণ ও ড্যানিশ। আয়োডিনযুক্ত লবণের মধ্যে এসিআই ও মোল্লা সল্ট; ধনিয়া গুঁড়ার মধ্যে এসিআই পিওর, নুডলসের মধ্যে নিউজিল্যান্ড ডেইরির নুডলস এবং চিপসের মধ্যে কাশেম ফুডের সান ব্র্যান্ড রয়েছে।

এরমধ্যেই বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় ভেজাল প্রমাণিত হওয়ায় প্রাণের গুঁড়া হলুদ, কারি পাউডার, লাচ্ছা সেমাইসহ বিভিন্ন কোম্পানি ও

ব্র্যান্ডের ৫২টি খাদ্যপণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে এসব খাদ্যপণ্য বিক্রি ও সরবরাহে জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই।

নেটফ্লিক্স-এ অনুমতি

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং একটি বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম পিআই স্ট্র্যাটেজির জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং সেবা নেটফ্লিক্সের গ্রাহকসংখ্যা বাংলাদেশে দুই লাখের ওপরে সে হিসাবে গ্রাহক প্রতি ৯ ডলার করে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে নেটফ্লিক্সের আয় ১৮ লাখ ডলার বা ১৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। বর্তমানে প্রায় ১৯০টি দেশে নেটফ্লিক্সের গ্রাহক ১৪ কোটি ৮০ লাখের মতো। এই সেবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইডথ কেনার ব্যয় এড়াতে এবং মানসম্মত সেবা পাওয়ার শর্ত সাপেক্ষে দেশে এর ক্যাশ সার্ভার স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। ৩০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিটিআরসির সর্বশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে নতুন নতুন টিভি শো ও চলচ্চিত্র এ সেবায় যোগ করা হয়। এই সেবা পাওয়ার জন্য গ্রাহককে নেটফ্লিক্স সাইটে ক্রেডিট কার্ডের তথ্য দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। ওই ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেই এর সেবার ফি পরিশোধ করতে হয়। এতে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমার পাশাপাশি এর সেবার মানও অনেক ভালো হবে।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

তৈরি পোশাক খাতের ওপর ভর করে দেশের রপ্তানি আয় বাড়ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৬১ শতাংশ। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এমন তথ্য উঠে এসেছে। তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন হাজার ১৯০ কোটি ডলার। এর বিপরীতে আয় হয়েছে তিন হাজার ৩৯৩ কোটি ২৭ লাখ ডলার। সেই হিসাবে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬.৩৬ শতাংশ বেশি আয় হয়েছে। গতবছর একই সময়ে যা ছিল তিন হাজার ৪০ কোটি ৬৪ লাখ ডলার।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে সম্প্রচার শুরু

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দিয়ে টিভি চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার শুরু হয়েছে ১২ই মে থেকে। পর্যায়ক্রমে সব টিভি চ্যানেলকে স্যাটেলাইটের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। স্যাটেলাইট থেকে ক্যাবল টিভি দেখার সেবা 'ডাইরেক্ট টু হোম' বা ডিটিএইচ সেবাও নিশ্চিত করা হবে বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

আইসিটি মন্ত্রী আরো জানান, ১৯শে মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে স্যাটেলাইটটির বহুমুখী ব্যবহারের ওপর কয়েকটি প্রদর্শনী হবে।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৯শে মে ২০১৯ হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বর্ষপূর্তি ও সেবা বিপণন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মদ পলক এ সময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং নেলদেনে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, সব টিভি চ্যালেনকে স্যাটেলাইটের আওতায় আনা এবং এ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভাসানচরে ইন্টারনেট সেবাও নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়া অনলাইন ব্যাংকিং লেনদেনে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

জোরদার, সব টিভি চ্যানেলকে স্যাটেলাইটের আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যে স্যাটেলাইটের পরীক্ষামূলক কাজও শেষ হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সব এটিএম বুথ কোনো ধরনের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ছাড়াই এ স্যাটেলাইটের আওতায় আনা হবে। ফলে সাইবার অপরাধ কমে যাবে।

ডিজিটাল পড়ার ঘর

ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে সনদ। নাম ডিজিটাল স্টাডি রুম। সনদ অ্যাডুকেশনের তৈরি ডিজিটাল স্টাডি রুমে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুযায়ী, প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা স্বল্প খরচেই এসব কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে ১১ বছর পর্যন্ত যা শেখানো হচ্ছে তা মূলত অন্যান্য দেশের শিশুরা সাড়ে ছয় বছরের মধ্যেই শিখছে। ফলে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তর শেষ করলেও তারা সাড়ে চার বছর পিছিয়ে থাকছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় এ শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব। এর অংশ হিসেবে প্রতিটি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জাম সরবরাহ করছে বর্তমান সরকার। শিক্ষকদের মাল্টিমিডিয়া নির্ভর ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সুফল পেতে ডিজিটাল স্টাডি রুমের মতো সেবা কাজে লাগবে।

সনদ এডুকেশনের চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যাডি বলেন, ২০১২ সাল থেকে তাঁরা ডিজিটাল শিক্ষায় উপকরণ তৈরিতে কাজ শুরু করেন। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কম্পিউটার প্রকৌশলী সাইদুজ্জামান। পরে ডিজিটাল মাধ্যমে একে এগিয়ে নিতে শিক্ষকদের সমন্বয়ে তৈরি শুরু হয় যুগোপযোগী কনটেন্ট। বর্তমানে রাজধানীর পান্থপথের অফিসে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মিলে ২৪ জন কর্মী কাজ করছেন সনদে। সনদের ডিজিটাল কনটেন্টগুলো পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন স্কুলে এবং শিক্ষার্থীরা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করেছে। এখন সনদের ডিজিটাল স্টাডি রুমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছে ৩৮ হাজার শিক্ষার্থী।

গুগলের প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশের জাহিদ

প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলের প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার (ডিরেক্টর) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ জাহিদ সবুর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বার্তায় জাহিদ নিজেই তার এ অর্জনের কথা জানান। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এআইইউবি) সাবেক এ শিক্ষার্থী ২০০৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানিটিতে। সারা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনটিতে বর্তমানে ফুলটাইম কর্মী আছেন লাখ খানেকের মতো। এদের মধ্যে আড়াইশ জনের মতো আছেন প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার। জাহিদ এদেরই একজন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা জারি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক পদে নিয়োগ নারী প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। এতদিন নারীদের ন্যূনতম শিক্ষগত যোগ্যতা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি। তবে পুরুষ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আগের মতোই দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের রাখা হয়েছে। এছাড়া যে কোটায় (নারী, পুরুষ ও পোষ্য) শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, সেই কোটার ২০ শতাংশ প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। তা না হলে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা যাবে। এমন বিধান রেখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৯ই এপ্রিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মো. আকরাম আল-হোসেন একথা জানান। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী আগের মতোই ৬০ শতাংশ নারী, ২০ শতাংশ পোষ্য এবং ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীদের দিয়ে পদগুলো পূরণ করা হবে। উপজেলা বা থানা ভিত্তিক এই নিয়োগ হবে। প্রধান শিক্ষক ও সহাকারী শিক্ষক পদে আবেদনের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ থেকে ৩০ বছর।

তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতি সচেতন হওয়ার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২৭শে এপ্রিল কুমিল্লা টাউন হল বীরচন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'ইয়াং এন্ট্রাপ্রেনিউর সামিট'-এ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং দেশের জনসংখ্যার বেশিরভাগই তরুণ। তিনি তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতি সচেতন হওয়ার এবং ধূমপান ও মাদককে ত্যাগ করার আহ্বান জানান। এছাড়া তরুণদের দেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে জানতে এবং শিখতে হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৬ই মে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফলের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী এসময় লন্ডনে অবস্থান করায় বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ফলাফল তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রী এক বাণীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের এবং অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের ধৈর্য সহকারে পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এ বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ১০ শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৮২.২০%, মোট পরীক্ষার্থী ২১,২৭,৮১৫, পাস করেছে ১৭,৪৯,১৬৫ জন। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১,০৫,৫৯৪ শিক্ষার্থী। এরমধ্যে ছাত্রী ৫৩,৪৮৪ এবং ছাত্র ৫২,১১০ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ২,৫৮৩। ছাত্রী পাসের হার ৮৩.২৮% আর ছাত্র পাসের হার ৮১.১৩%

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদেশি বিনিয়োগে এখন সুসময়

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সালে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৩৬১ কোটি ৩৩ লাখ মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ৬৮ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) বলছে, এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ।

বিনিয়োগ রেকর্ড: ২০১৭ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছিল প্রায় ২১৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ৮ শতাংশ কম। এ বছর বিদেশি বিনিয়োগ এক লাফে ১৪৬ কোটি ডলার বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে এই প্রথম বাংলাদেশ এক বছরে ৩০০ কোটি ডলারের বেশি বিদেশি বিনিয়োগ পেল।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে এতদিন বিনিয়োগকারীদের ধারণা ছিল না, এখন সেটা নানাভাবে বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। এদেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো খুব ভালো ব্যবসা করছে, উচ্চ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করছে। জাপানের বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা জেট্রোর প্রতিবেদনে বাংলাদেশে মুনাফার সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। ব্যবসা সহজ করতে বিডা কাজ করছে। যা বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি জুতার সুদিন

তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বাংলাদেশে তৈরি জুতারও বড়ো বাজার এখন যুক্তরাষ্ট্রে। বাজারটিতে দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয় সর্বোচ্চ পোশাক রপ্তানি করে আসছেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা। আর কয়েক বছর ধরে জুতা রপ্তানিতেও ভালো করছেন এদেশের রপ্তানিকারকেরা। ফলে চার বছরের ব্যবধানে দেশটিতে জুতা রপ্তানি দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্স) তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ৬ কোটি ১৪ লাখ ডলারের জুতা রপ্তানি হয়েছিল। গত বছর সেই রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ কোটি ৩২ লাখ মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ১৩২ কোটি টাকা হয়েছে। রপ্তানির এই পরিমাণ ২০১৭ সালের চেয়ে ১ কোটি ৯৯ লাখ ডলার বা ১৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেশি।

শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় অন্য সব দেশের বাজারেও বাংলাদেশের জুতা রপ্তানি বেড়েছে। গত অর্থবছরে ৫৬ কোটি ডলারের চামড়ার জুতা রপ্তানি হয়েছিল। সে সময় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) সেই প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ। রপ্তানির পরিমাণ ৪৫ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে ২৪ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

ভারত বাংলাদেশে স্মার্ট সিটি তৈরিতে আগ্রহী

ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস ৬ই মে ২০১৯ অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে শেরেবাংলা নগরে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস ৬ই মে ২০১৯ শেরেবাংলা নগরে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। সময়ের আবর্তনে এ সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভর করে পরিপক্কতা লাভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ভারতের সাথে বহুবিধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভালো সম্পর্ক, বিশ্বাস, পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মানের ভিত্তিতে নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ভারতের সাথে সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তৃতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণে ভারতের সঙ্গে বিদ্যুৎ, রেলপথ, সড়ক, জাহাজ চলাচল, বন্দরসহ অবকাঠামো খাতে ১৭টি অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ।

ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী বাংলাদেশকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সাম্প্রতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে রেল ও সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের দিকে আরো বেশি জোর দিতে হবে। ভারত বাংলাদেশের উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশের এলএনজি, বিদ্যুৎ খাতসহ বিভিন্ন খাতে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

৫১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন ইউএনও ফরিদা ইয়াসমিন

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা ইয়াসমিন এক বছর সাত মাসে এলাকায় ৫১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। ২৯শে এপ্রিল প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, তিনি শুধু বিবাহ বন্ধ করেই ক্ষান্ত হন না, এদের মধ্যে যারা অসচ্ছল পরিবারের তাদের নিজ খরচে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। রাত-দিন, রোদ-বৃষ্টি কিছুই মানেন না, বাল্যবিবাহের খবর শুনলেই সেখানে হাজির হন। বিয়ে বন্ধ করেই থেমে থাকেন না, ওই মেয়েকে আবার নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে উৎসাহ দেন।

জামালপুরের মেয়ে ফরিদা ইয়াসমিন ২০১৭ সালে মে মাসে বারহাট্টায় ইউএনও হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে আইন প্রয়োগ ছাড়াও মানুষকে সচেতন করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময়সহ বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় নানা কর্মসূচি পালন করছেন।

কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি তোলার নেতৃত্বে নারী

পৃথিবী থেকে প্রায় ৫৪ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে মেসিয়ার ৮৭ ছায়াপথের কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবিটি প্রকাশের পর পরই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এটি পৃথিবীতে কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি। আর এ সাফল্যের নেতৃত্বে ছিলেন ২৯ বছর বয়সি এক নারী। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও তড়িৎ প্রকৌশলী ক্যাথেরিন লুইস বওমান বা কেটি বওমান।

কেটি মূলত সিএইচআরপি নামের একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই প্রোগ্রামে দক্ষিণ মেরু, চিলি, স্পেনসহ পৃথিবীর আটটি জায়গায় স্থাপিত টেলিস্কোপ থেকে পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি একক ছবি পাওয়ার অ্যালগরিদম ছিল। বিজ্ঞানীদের তিনটি দলের মধ্যে ৪০ জনের একটি দলকে তিনি নেতৃত্ব দেন।

উল্লেখ্য, কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ শক্তি এত তীব্র যে-কোনো বস্তুকণা অথবা আলো সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। তাই মানুষ এতদিন ভেবেই নিয়েছিল, কৃষ্ণগহ্বরের কোনো ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে বিজ্ঞানীরা।

নারীদের জন্য নিরাপদ দেশ নরওয়ে

নারীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বাসযোগ্য ১০ দেশের মধ্যে প্রথম হলো নরওয়ে। এরপরেই আছে সুইডেন, কানাডা, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া ও এস্তোনিয়া। সম্প্রতি নারীদের জন্য সবচেয়ে বাসযোগ্য ও বাসের অযোগ্য দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে আবাসনভিত্তিক অনলাইন ওয়েবসাইট নেস্টপিক।

'উইমেন্স লিভেবিলিটি ইনডেক্স ২০১৯' শীর্ষক এই তালিকা তৈরিতে বিশ্বের ১০০টি দেশের ওপর গবেষণা চালিয়েছে নেস্টপিক। এ গবেষণায় নারীদের অবস্থা চারটি ক্যাটাগরিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো– অবকাঠামো, বৈষম্য, আইন ও কর্মক্ষেত্র। অবকাঠামো ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নিরাপত্তার বিষয়টিকে।

নারীদের জন্য যেসব দেশে পথ চলা কঠিন সেই তালিকায় সবচেয়ে আগে রয়েছে নাইজেরিয়া। এরপর রয়েছে ইথিওপিয়া, পাকিস্তান, উগান্ডা, মোজাম্বিক, লাওস, তানজানিয়া, ক্যামেরুন ও মিসর।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

সেরা ওয়ার্ডকে দেওয়া হবে মেয়র ও মুজিব বর্ষ অ্যাওয়ার্ড

প্রতিবছর সেরা ওয়ার্ডের জন্য মেয়র অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এছাড়াও ২০২০ সাল থেকে সর্বোত্তম নাগরিক সেবা প্রদানকারী ওয়ার্ডকে দেওয়া হবে 'মুজিব বর্ষ অ্যাওয়ার্ড'। মশক নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদানে উৎসাহ বাড়াতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। ২৯শে এপ্রিল গুলশানস্থ ডিএনসিসি'র নগরভবনে 'ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের বাহক এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় মেয়র আতিকুল ইসলাম এই ঘোষণা দেন।

সভায় মেয়র বলেন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে জনসচেতনতার বিকল্প নেই। এলক্ষ্যে ডিএনসিসির প্রতিটি অঞ্চল ও ওয়ার্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মতবিনিময়, অবহিতকরণ সভা ও প্রচারণা চালানো হবে। মতবিনিময় সভায় লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণে শতকরা ৯০ ভাগ কাজ জনগণের। তিনি সবার উদ্দেশে বলেন, মেয়রকে সবাই সহযোগিতা করলে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আমাদের তরুণ সমাজসহ সবাইকে এতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ প্রকল্প

'সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধ' শীর্ষক ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স-এর একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। যা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২নং ও ৫ নং ওয়ার্ড এবং মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। যার উদ্দেশ, নারী ও শিশুর সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় সচেতন করা।

২৯শে এপ্রিল ২০১৯ ঢাকার মিরপুরে ২ নং ওয়ার্ড এর প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুর রউফ নান্নু। সভায় প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ২৫০ কিশোর-কিশোরী ও নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশুর প্রতি নির্যাতন বিশেষত শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে কাজ করে আসছে। একইসঙ্গে সমাজের অন্যান্য অধিকার বঞ্চিত গোষ্ঠী বিশেষত প্রান্তিক নারীদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধেও কাজ করছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষতিকর গ্রোথ হরমোনের বিকল্প প্ল্যানটেইন ঘাস

অল্প সময়ে অধিক মাংস উৎপাদনে ব্রয়লার মুরগিতে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা গ্রোথ প্রোমোটর (বৃদ্ধিবর্ধক পদার্থ) ব্যবহার করেন অনেকেই। ফলে এই মাংস থেকে মানবদেহে ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশের আশঙ্কায় ব্রয়লার মুরগি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ক্ষতিকর কোনো হরমোন ব্যবহার না করে প্ল্যানটেইন নামের এক প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করেই কম সময়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। চার বছর ধরে এ সংক্রান্ত গবেষণা করে সফল হয়েছেন ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মোহাম্মদ আল-মামুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল পশুপুষ্টি গবেষণাগারে প্যানেল টেস্টের মাধ্যমে গবেষণায় সফলতার কথা জানান তিনি। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, এ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত মাংসের পুষ্টিগুণ তুলনামূলক বেশি বলে দাবি করেছেন পশুপালন অনুষদের পশুপুষ্টি বিভাগের এই অধ্যাপক।

গবেষক আল-মামুন বলেন, ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধি করলেও প্রাণিদেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। এ থেকে উৎপাদিত পশুপণ্য অর্থাৎ মাংস, দুধ কিংবা ডিম গ্রহণের ফলে মানুষের শরীরে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, অটিজমসহ বিভিন্ন ভয়াবহ রোগ দেখা দিতে পারে। উন্নত দেশে এসব হরমোন নিষিদ্ধ হলেও আমাদের দেশে ব্যবহার হয়ে আসছে। ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসেবে ২০০৪ সালে জাপানে সর্বপ্রথম প্ল্যানটেইন উদ্ভিদের ওপর গবেষণা শুরু করে।

আল-মামুন আরো বলেন, দীর্ঘ গবেষণায় এর আগে গবাদিপশু (গরু ও ভেড়া) মোটাতাজাকরণে ক্ষতিকর গ্রোথ হরমোনের বিকল্প হিসেবে প্ল্যানটেইন ঘাস ব্যবহারে সফল হই। প্রাণিজ আমিষের অন্যতম ও সহজলভ্য ব্রয়লার মুরগির মাংস গ্রহণে মানুষের অনীহা সৃষ্টির বিষয়টি অনুধাবন করে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করি। মজার ব্যাপার হলো– প্ল্যানটেইন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রয়লার মাংসের পুষ্টিগুণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মাংসের চেয়ে এতে মানবদেহের উপকারী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে ওমেগা ৩-এর পরিমাণ বেশি পাওয়া গেছে। ওমেগা ৩ একটি

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ ৪ঠা মে ২০১৯ হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'রিজিওনাল কনসাল্টেশন অন দ্য গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর সেফ, অর্ডারলি অ্যান্ড রেগুলার মাইগ্রেশন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহ্‌রিয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

ফ্যাটি এসিড, যা মানবদেহে ক্ষতিকর চর্বির পরিমাণ কমিয়ে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, চোখের ছানি, স্মৃতিভ্রম এবং অল্প বয়সে বুড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমিয়ে দেয়।

প্ল্যানটেইন Plantago lanceolata একটি বহুবর্ষজীবী ঘাস জাতীয় বিরুৎ উদ্ভিদ। ২০১১ সালে বাংলাদেশে প্ল্যানটেইন নিয়ে গবেষণা শুরুর ৩ বছর পর এই উদ্ভিদকে অভিযোজিত ও চাষ-উপযোগী করতে সক্ষম হন তিনি। ২০১৭ সালে থেকে মানিকগঞ্জে কৃষকপর্যায়ে প্ল্যানটেইন ঘাস উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতি একর জমিতে ১২ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া যায়, যা দিয়ে ৪ লাখ ২০ হাজার ব্রয়লার মুরগি উৎপাদন সম্ভব।

স্বল্প পুঁজিতে পুদিনা চাষ

সীতাকুন্ডের কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন পুদিনা চাষে। স্বল্প পুঁজিতে অধিক মুনাফা, কম সময়ের মধ্যে বাজারজাতকরণ ও রমজান মাসে পুদিনার ব্যাপক চাহিদা থাকায় উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ জমিতে পুদিনার চাষ করা হয়েছে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মাঠে পুদিনার পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষকরা। বাড়ির পাশে খালি জমি, উঠানে ও পাহাড়ের ঢালুতে পুদিনা চাষ করা হচ্ছে। রমজানে বেশি দামে বিক্রির আশায় এই চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও। এছাড়া স্বল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়ায় কৃষকরা বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ শুরু করেছেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রকাশ করেছে ৩০শে এপ্রিল ২০১৯। এ পরীক্ষায় সহকারী সার্জন পদে চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা ৪,৫৪২ ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা ২৫০। উল্লেখ্য, ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষা ৩রা আগস্ট ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় সহকারী সার্জন পদে আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২,৫৬৮ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৫,১৪৫ জন। MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় সহকারী সার্জন পদে ১৩২১৯ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৫৩১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১০ই অক্টোবর শুরু হয়। ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd-এ পাওয়া যায়। তাছাড়া টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে-কোনো মোবাইল থেকে এসএমএস করে ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) ফলাফল জানা যায়।

অনুষ্ঠিত হলো ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি অনুষ্ঠিত হয় ৩রা মে ২০১৯। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ৪০তম বিসিএসে পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ জন প্রার্থী। পিএসসির ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড। কোনোও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিএসসির অধীনে এত সংখ্যক আবেদন আগে কখনো জমা পড়েনি। এবারের পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১ হাজার ৯০৩ জন ক্যাডার নিয়োগ দেওয়া হবে। ক্যাডার অনুসারে প্রশাসনে ২০০, পুলিশে ৭২, পররাষ্ট্রে ২৫, করে ২৪, শুল্ক আবগারিতে ৩২ ও শিক্ষা ক্যাডারে প্রায় ৮০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রবাসী শ্রমিকের স্বার্থ, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, প্রবাসী শ্রমিকের স্বার্থ, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি বলেন, মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাধারা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। তিনি আরো বলেন, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবাসী শ্রমিকের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ৪ঠা মে ২০১৯ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'রিজিওনাল কনসাল্টেশন অন দ্য গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ফর সেফ, অর্ডারলি অ্যান্ড রেগুলার মাইগ্রেশন' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এসময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সমন্বিত উদ্যোগে বিশ্বাস করে। তিনি আরো বলেন, জিসিএম বাস্তবায়নে সিভিল সোসাইটি ও বিজনেস কমিউনিটিকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। এতে আরো বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে স্পেনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন রিভিউ ফোরামের কো-ফ্যাসিলিটেটর অগাস্টিন সান্তোস মারেভার, সিভিল সোসাইটি একশন কমিটির কো-অর্ডিনেটর কলিন রাজাহ, আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার বাংলাদেশ প্রধান গিয়র্গি গিগারিওসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, আই ও এম এবং আই এল ও-এর প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রিধারী, দক্ষ ও পেশাদার তথা উপযুক্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেওয়াসহ একটি পাঠ উপযোগী কার্যকর লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ২৮শে এপ্রিল ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ-এর যৌথ আয়োজনে 'গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নে জাতীয় নীতি' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আশীষ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ-এর লাইব্রেরিজ আনলিমিটেডের প্রোগ্রাম পরিচালক কার্স্টি ক্রফোর্ড। কর্মশালায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সরকারি ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিবৃন্দ, লাইব্রেরি প্রফেশনাল, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়াতে গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ শুরু

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে এবং গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়াতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাস সার্ভিসের চালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ট্রাফিক আইনের বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম ২৯শে এপ্রিল নগরীর বনানীস্থ বিআরটিএ ভবনে প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্‌বোধন করেন।

এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রতিটি ব্যাচে একশ জন করে গাড়িচালক অংশ নিবেন। ২৯শে এপ্রিল দুটি ব্যাচের দশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহানগরীর ও আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসের চালকদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কর্মশালার প্রথমদিনে সম্পদব্যক্তি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুল হক।

এ সময় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব বলেন, গাড়িচালকদের দক্ষতা বাড়াতে এ প্রশিক্ষণ বিআরটিএ'র চলমান কার্যক্রমেরই অংশ। তিনি বলেন, নানা কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনার কারণগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে চালকদের দিক নির্দেশনা দিবেন প্রশিক্ষকগণ। এতে সড়ক দুর্ঘটনা কমে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সিলেট বিভাগের কদমতলী এলাকায় শত কোটি টাকায় বাস টার্মিনাল আধুনিকায়ন

সিলেট বিভাগের সবচেয়ে বড়ো বাস টার্মিনাল হচ্ছে কদমতলী বাস টার্মিনাল। এ টার্মিনালের মাধ্যমেই সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের বাস যোগাযোগের মাধ্যমে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে টার্মিনালটির আধুনিকায়নের দাবি জানিয়ে আসছিলেন যাত্রীরা। তারই ধারাবাহিকতার হাত ধরে সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এ টার্মিনালকে আধুনিকায়ন করতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১১৭ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সিসিক সূত্র জানায়, প্রায় সাড়ে ৭ একর জমিতে নির্মিত কদমতলী বাস টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ দূরপাল্লার বাস এবং অভ্যন্তরীণ সড়কে প্রায় এক হাজার বাস চলাচল করে থাকে। দিনভর যাত্রীদের পদচারণায় মুখর থাকে এ টার্মিনাল। সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বাস টার্মিনাল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। বাসের প্রবেশপথ, বহির্গমন পথ, প্রত্যেক রুটের বাসের জন্য আলাদা পার্কিং জোন থাকবে এখানে।

কদমতলী বাস টার্মিনালের কাজ এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। সিসিকের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান জানান, দুটি প্রক্রিয়ায় বাস টার্মিনালটি আধুনিকায়ন করা হবে। এর একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ, অপরটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ৫৬ কোটি টাকা এবং অবকাঠামোগত খাতে ৬১ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর মাধ্যমে যাত্রীদের বিশ্রামাগার, টয়লেট, বিশুদ্ধ পানি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কক্ষ নির্মাণ করা হবে। টার্মিনালের সব ময়লা আবর্জনা যাবে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। এ প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে ২০২০ সালের জুনের মধ্যে। সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বাস টার্মিনাল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। বাসের প্রবেশপথ, বহির্গমন পথ, প্রত্যেক রুটের বাসের জন্য আলাদা পার্কিং জোন থাকবে এখানে। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে এখানে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ

পৃথিবী এবং জীবন বাঁচাতে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। ১৫ই এপ্রিল জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ই কোর্সের উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন (এফএফজি) ফোরামে কান্ট্রি স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার, যা উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এছাড়া এলডিসি থেকে উত্তরণকারী দেশগুলোর টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক পর্যায়ে নীতিগত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে সহযোগিতার পদক্ষেপগুলো অপসারিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহ্বান জানান অর্থমন্ত্রী।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ১৭ই এপ্রিল ২০১৯ সিরডাপ মিলনায়তনে Third National Communication (TNC) of Bangladesh to the UNFCCC বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

'টেকসই উত্তরণ' অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটি। বাংলাদেশ দ্রুততার সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করেছে এবং এ রূপকল্পদ্বয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিশ্বকে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এমপি বলেন, পৃথিবীর উষ্ণায়ন ঠেকাতে হলে সারা বিশ্বকেই গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে। তা না হলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বকে আরো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ১৭ই এপ্রিল ২০১৯ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে থার্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন অব বাংলাদেশ টু দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরো বলেন, জ্বালানি পরিবহণ, শিল্প-কারখানা, কৃষি, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, বন উজাড় ও অবক্ষয় এবং বর্জ্যের মতো ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস বেশি পরিমাণে নিঃসরিত হচ্ছে। বিশ্বের জাতিগুলো চাইলে এসব ক্ষেত্র থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বহু পরিমাণে কমাতে পারে।

প্রতিবেদক: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-দিল্লি রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট

ঢাকা-দিল্লি রুটে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী উড়োজাহাজ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হিসেবে ১৩ই মে বেলা ৩টায় একমাত্র বাংলাদেশি এয়ারলাইন্স হিসেবে রুটে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বিমানের নতুন এ রুট উদ্‌বোধন করে বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, বিমানের সরাসরি দিল্লি ফ্লাইট আবার হওয়ায় তা আরো ভালোভাবে জনগণের সেবায় পৌঁছাতে পারবে। তিনি বলেন, সবার চেষ্টায় বিমান সংকট কাটিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। লিজে আসছে আরো দুটি বোয়িং এয়ার। আগামী বছর বিমান বহরে যোগ হবে নিজস্ব আরো তিনটি ড্যাশ এয়ার ক্রাফট। জুলাইয়ে আসা প্রথম ড্রিম লাইনার দিয়ে আমরা গুয়াংজু ও মদিনায় সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করব। বিমান সচিব মুহিবুল হক বলেন, বিমানে যে সমস্যা ছিল তা কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে বিমান। রুট বাড়ছে, এয়ার ক্রাফটও বাড়ছে।

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ছে

পদ্মা সেতু চালু হলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগর থেকে বন্দর জেটি পর্যন্ত প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার সংযোগ চ্যানেলের ড্রাফট (গভীরতা) বাড়াতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়ে চলমান রয়েছে। কার্গো হ্যান্ডেলিংয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে তিন হাজার কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলছে। সব মিলিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে মোংলা বন্দর। জানা যায়, মোংলা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জেটি নির্মাণের ১১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। বন্দরের পাঁচটি জেটির কার্যক্ষমতার ৭০-৮০ শতাংশ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতের চাপের কথা চিন্তা করে আরো ৯টি জেটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চীনের অর্থায়নে দুটি, ভারতের অর্থায়নে আরো দুটি জেটি নির্মাণ করা হবে। বড়ো ড্রাফটের (গভীরতা) জাহাজের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে বন্দরের বহির্নোঙর থেকে জেটি পর্যন্ত চ্যানেলের নাব্যতা বাড়াতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং চলছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর এ কে এম ফারুক হাসান বলেন, পদ্মা সেতু চালু হলে সড়কপথে রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে কাছাকাছি সমুদ্রবন্দরের স্থানটি দখল করবে মোংলা বন্দর। তখন এই বন্দর দিয়ে আমদানি ও রপ্তানি খরচ অনেকগুণ কমে যাবে। সংগত কারণেই আমদানি ও রপ্তানিকারকরা অর্থ সাশ্রয়ে মোংলা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালন

রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৩শে এপ্রিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের উদ্‌বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এ বছরের পুষ্টি সপ্তাহের স্লোগান 'খাদ্যের কথা ভাবলে, পুষ্টির কথাও ভাবুন'। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই সপ্তাহ চলে ২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহিদ মালেক বলেন, অপুষ্টি দূর করতে ২২টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষের অপুষ্টি দূর করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে সম্ভব নয়। পাশাপাশি মানুষকে পুষ্টি বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রতি উপজেলায় ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। ২৬শে এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত জামালপুর সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার প্রীতি সম্মিলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জামালপুরে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ করা হবে।

গাড়িচালকদের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা

সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ১ হাজার ২০০ গাড়িচালককে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা দিয়েছে জুনিওর চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা ওয়েস্ট। ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে এ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ চিকিৎসা কার্যক্রম চলে। জেসিআই ঢাকা ওয়েস্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা জেসিআই ইন্টারন্যাশনালের একটি প্রকল্প।

বিএসএমএমইউ'তে জরুরি বিভাগ চালু হচ্ছে

পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শুরু হবে। এখানকার চিকিৎসকেরা শুধু নিজ প্রতিষ্ঠানেই পেশার চর্চা করবেন এমন উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। ২৯শে এপ্রিল বিএসএমএমইউ ২২তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া এ তথ্য জানান।

৫৬টি বিভাগ চালু থাকলেও বিএসএমএমইউ'তে সাধারণ জরুরি বিভাগ ছিল না। এখানে প্রতিদিন গড়ে সাত হাজার রোগী বহির্বিভাগে সেবা নেয়।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিজিটাল ডিভাইস 'কিয়স্ক'-এর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার

মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকার সবধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। মাদকের জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। তাই আমরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনকে আমরা যথোপযুক্ত করেছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাদকের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখছে। ১৫ই মে ২০১৯ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ডিজিটাল ডিভাইস 'কিয়স্ক'-এর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রমের

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান এসব কথা বলেন। ডিজিটাল ডিভাইস 'কিয়স্ক' যুক্ত এলইডি ডিসপ্লে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হবে। এতে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত মাদকবিরোধী বিভিন্ন শর্টফিল্ম, টিভিস, নাটক-নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া মাদক সংক্রান্ত সবধরনের হালনাগাদ তথ্য এতে দেওয়া হয়। ফলে এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সর্ম্পকে জানতে পারবে এবং সচেতনতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

২০শে মে ২০১৯ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ–পিআইডি

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের রিসোর্স শিক্ষক নিয়োগ ও বিসিএস পরীক্ষায় শ্রুতি লেখক নিয়োগের জটিলতা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ

'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে যোগদানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনাসভা ২০শে মে ২০১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকরাম খাঁ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট পরিষদের আয়োজনে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি। সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট পরিষদের মনোনীত সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর আশ্বাস প্রদান করে তাদের ৬ দফা দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি প্রতিবন্ধীদের সকল সমস্যা সমাধানে সমাজ কল্যাণমন্ত্রীসহ সংশিষ্ট সকলকে নিয়ে একযোগে কাজ করার কথা উলেখ করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের রিসোর্স শিক্ষক নিয়োগ ও বিসিএস পরীক্ষায় শ্রুতি লেখক নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট পরিষদের আহ্বায়ক মো. আলী হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুস সাকিব, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. আরিফ হোসেন, শাহরিয়ার শাহ পিংকি প্রমুখ।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পথশিশুর জন্য ইতালি থেকে বাংলাদেশে

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পথশিশুদের জন্য কাজ করেন ইতালির ব্রাদার লুসিও। 'পথশিশু সেবা সংগঠন' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে ১২ বছর ধরে তিনি এই কার্যক্রম চালাচ্ছেন। ঢাকা ও সিলেটের পর বর্তমানে এক মাস ধরে চট্টগ্রামের পথশিশুদের নিয়ে কাজ করছেন লুসিও।

সংগঠনটি পথশিশুদের চিকিৎসা, পড়ালেখা, স্কুলে ভর্তি, পুনর্বাসনের পাশাপাশি পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করে থাকে। এছাড়া চিত্রাঙ্কন, খেলাধুলা, বেড়ানো, বনভোজন সব কিছুই করে শিশুদের জন্য। আয়োজন করা হয় শিশু চলচ্চিত্র উৎসবেরও।

এ কাজের জন্য ঢাকায় প্রায় সাড়ে ৮০০ স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে এ সংগঠনে। সিলেটে তার স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে দেড়শ'র মতো। এ সংগঠনের মাধ্যমে ১২ বছরে সেবা দেওয়া হয়েছে প্রায় ১২শ পথশিশুকে। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামে কাজ করছেন। ১২ই মে তিনি চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে শিশুদের বর্ণমালা শেখাচ্ছিলেন। তখন তিনি বলেন, পথশিশু আমার সৃষ্টি, তোমার সৃষ্টি। কেন তারা রাস্তায়

ঘুমাবে? আমরা একটা বন্ধন তৈরি করতে চাই। তাদের মানবপ্রেমী করতে চাই। ধনী-গরিব, লম্বা-বেঁটে কোনো ভেদাভেদ নয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

গানে কবিতায় নৃত্যে রবীন্দ্র বন্দনা

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বাঙালির প্রেরণার উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই মে রাজধানীর অনুষ্ঠান কেন্দ্রগুলোতে ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও নাটকের আয়োজন।

জাতীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। এবারের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য–'মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ'। কবিগুরুর স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, নওগাঁর পাতিসর, খুলনায় দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এ উপলক্ষে রবীন্দ্র মেলা, রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস

ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স কাউন্সিলের আহ্বানে ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ২৯শে এপ্রিল পালন করা হয় 'আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস'। বাংলাদেশে এ দিবসটি ১৯৯৫ সাল থেকে পালিত হচ্ছে। 'আমার নূপুরের ধ্বনি ছড়াক মানবতার বাণী'–এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ২৩শে এপ্রিল থেকে শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা প্লাজায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা।

এদিন শিল্পকলা একাডেমিতে মঙ্গল নৃত্য নাম দিয়ে নৃত্যাশিল্পীরা যে ছন্দমাধুর্যের লহরি তুলেছিলেন তা ছড়িয়ে পড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। দেশ বরেণ্য নৃত্য শিল্পীদের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশু, প্রতিবন্ধী শিল্পী সবাই মিশেছিল এক কাতারে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ২৯শে এপ্রিল ২০১৯ শিল্পকলা একাডেমিতে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পে অবদানের জন্য মনোনীতদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন–পিআইডি

শিল্পকলায় যাত্রা উৎসব

'যাত্রা শিল্পের নবযাত্রা' শীর্ষক ৫টি নতুন যাত্রা প্রযোজনা নিয়ে ২৩শে এপ্রিল শুরু হয় তিন দিনব্যাপী যাত্রা উৎসব। শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটারে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আতাউর রহমান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন একাডেমির পরিচালক মো. বদরুল আলম ভূঁইয়া। এ উৎসব চলে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, দীর্ঘ সশস্ত্র সংঘাত নিরসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির অবাস্তবায়িত কিছু বিষয় দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হবে। ১৫ই মে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে ৪ সদস্যর একটি প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ সময় চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট দপ্তর হস্তান্তর, বিভিন্ন আইন ও বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বান্দরবানের ছেলেমেয়েরা

বান্দরবান পার্বত্য জেলার সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্দেশে ৫ই মে ২০১৯ বান্দরবানে হয়ে গেল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ৫ই মে রাতে বান্দরবান ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের হল রুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ত্রিপুরা, চাকমা, খুমী, চাক, ম্রো, বম ও মারমা সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বিভিন্ন লোকসংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে এবং সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারণ ফুটিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার মো. শাহিদুল এমরান এএফডব্লিউসি, পিএসসি। অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শাহিদুল এমরান বলেন, বান্দরবানের ছেলেমেয়েরা সংস্কৃতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তারা আরো এগিয়ে যাবে। তাই তিনি বিভিন্ন ইভেন্ট এ অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরো ভালো কিছু করতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠান শেষে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ইভেন্টে বিজয়ী শিল্পীদের পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

সিডনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সরওয়ার ফারুকীর *শনিবার বিকেল*

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাফল্যের পর গুণী নির্মাতা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী পরিচালিত *শনিবার বিকেল* চলচ্চিত্রটি এবার নির্বাচিত হয়েছে সিডনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯-এর জন্য। ১০ই জুন দুপুর ২টায় এবং ১৩ই জুন রাত ৮টায় সিডনির ড্যান্ডি অপেরা সিনেমা হলের সিনেমা ওয়ান-এ চলচ্চিত্রটির দুটি প্রদর্শন হবে। জাজ মাল্টিমিডিয়া, ছবিয়াল এবং টেনডেম প্রোডাকশন প্রযোজিত এই চলচ্চিত্রটি ইতোমধ্যেই মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়ে দুটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুরি পুরস্কার অর্জন করে। এতে অভিনয় করেন–মামুনুর রশীদ, নুশরাত ইমরোজ তিশা, জাহিদ হাসান, ইরেশ যাকের, ইন্তেখাব দিনার, গাউসুল আলম শাওন, নাদের চৌধুরীসহ আরো অনেকে।

এবারের ঈদেও ভরসা শাকিব খান

ঢালিউডের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান এবারের ঈদেও ভরসা। মানে ঈদে শাকিবের একাধিক ছবি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। ২০০৮ সাল থেকেই ঈদের উৎসবে শাকিবের ছবি পেতে সিনেমা হল মালিকরা মুখিয়ে থাকেন। কারণ তার ছবি মানেই ব্যবসায়িক সফলতার মুখ দেখা। সিনেমা হলের দুর্দিন দূর হওয়া। এজন্য ২০০৮ সালে থেকেই ঈদে শাকিবের একাধিক ছবি মুক্তি পেয়ে আসছে এবং সফল হচ্ছে। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবারের ঈদে শাকিব খানের তিনটি ছবি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এগুলো হলো– পাসওয়ার্ড, নোলক এবং শাহেনশাহ। এর মধ্যে পাসওয়ার্ড হলো শাকিবের নিজের প্রযোজিত বিগ বাজেট ও অ্যারেঞ্জম্যান্টের ছবি। এতে শাকিবের নায়িকা বুবলী। নোলক ছবিতে শাকিবের বিপরীতে ববি আর শাহেনশাহতে আছেন নুসরাত ফারিয়া এবং রোদেলা জান্নাত।

কুলদীপ নায়ারের গল্প নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের গল্প নিয়ে নির্মিত হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সুরাইয়া। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ এবং রাজনৈতিক কারণে মানবতার যে বিপর্যয় তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কুলদীপ নায়ার লিখেছিলেন বেশ কিছু গল্প। তার লেখা গল্পের মধ্যে থেকে দ্য রুট অব অরিজিন গল্প থেকে এবার এদেশে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সুরাইয়া নির্মাণ করেন অনিরুদ্ধ রাসেল। চলচ্চিত্রের কাহিনি বিন্যাস ও সংলাপ লিখেন সজল আহমেদ। এ ছবির নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন– শিবা আলী খান। আরো অভিনয় করেন শহীদুজ্জামান সেলিম।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্টে আমিরুলের রৌপ্য জয়

ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় 'আন্তর্জাতিক মিক্সড মার্শাল আর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ' শেষ হয় ১১ই মে। এতে বাংলাদেশ মিক্সড মার্শাল আর্টস এ্যাসোসিয়েশন থেকে দুজন খেলোয়াড় অংশ নেন। এরা হলেন– আমিরুল ইসলাম ও মাহমুদুর রহমান। প্রতিযোগিতায় +৫৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে রৌপ্যপদক লাভ করেন নারায়ণগঞ্জের আমিরুল ইসলাম।

বছরের সেরা নারী ক্রীড়াবিদ হলেন তহুরা

৩০শে এপ্রিল ২০১৯ রূপচাঁদা-প্রথম আলো বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেলেন ফুটবলার তহুরা খাতুন। বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের এই ফুটবলার গত বছর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান। চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপেও বাংলাদেশের হয়ে ভালো খেলেছেন তহুরা। গত মার্চে হংকংয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ জকি কাপে দুটি হ্যাটট্রিকসহ ১৬ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছিলেন তহুরা। এরপর থিম্পুতে অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি দুর্দান্ত গোলও এসেছে এই ফরোয়ার্ডের পা থেকে। ফাইনালে ভারতের কাছে বাংলাদেশ হারলেও যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন তহুরা।

ইতিহাস গড়ে ১ম ত্রিদেশীয় সিরিজ জয় টাইগারদের

১৭ই মে ২০১৯ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার ত্রিদেশীয় সিরিজের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো কোনো টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতলো বাংলাদেশ। ডার্ক ওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ২৪ ওভারে ক্যারিবীয়দের দেওয়া ২১০ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে তামিম-সৌম্য ওপেনিং জুটি ঝড়ো সূচনা এনে দেয় বাংলাদেশকে। তামিম দলীয় ৫৯ রানে ব্যক্তিগত ১৮ রানে বিদায় নেন। ২৭ বলে ৫০ রান পূর্ণ করে টানা

তৃতীয় ফিফটি তুলে নেন সৌম্য। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৪৯ রান যোগ করেন সৌম্য ও মুশফিক। ৪১ বলে ৯টি চার ও ৩টি ছয়ে ৬৬ রান করে বিদায় নেন সৌম্য। মুশফিকও হাত খুলতে শুরু করেন। তবে ২২ বলে ৩৬ রান করে দলীয় ১৩৪ রানে বিদায় নেন তিনিও। মোহাম্মদ মিঠুন ১৭ রান করে আউট হন দলের রান যখন ১৪৩। সেসময় কিছুটা চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। এরপরই সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। ক্যারিবীয় বোলাদের ওপর রীতিমতো ঝড় বইয়ে দেন মেসাদ্দেক। ২০ বলে ৫০ রান করে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডটি নিজের করে নেন তিনি। ৭ বল হাতে রেখেই ২১০ রানের টার্গেট টপকে যায় টাইগাররা। ম্যাচ সেরা হন বাংলাদেশের মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত।

বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে বাংলাদেশ ও লাওস যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন

বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক নারী গোল্ডকাপে বাংলাদেশ ও লাওসকে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ফণীর কারণে বাতিল হওয়া খেলায় যৌথভাবে দুই দেশকেই

চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। ৩রা মে ৬টায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের ফাইনালে লাওসের মুখোমুখি হবার কথা ছিল ফেভারিট বাংলাদেশের। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কোনো ঝুঁকি নেয়নি বাফুফে। পরে লোকাল অর্গানাইজিং ও টুর্নামেন্ট কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাইনাল বাতিল করে যৌথভাবে দু'দলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে বাংলাদেশ

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) টি-টোয়েন্টির সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ৩রা মে। এবারের তালিকায় আছে ৮০টি দল। যেখানে আছে দশম স্থানে বাংলাদেশ। শীর্ষে থাকা পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ২৮৬। ২৬২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সমান ২৬১ পয়েন্ট নিয়ে তিন ও চারে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এই দুইয়ের চেয়ে এক পয়েন্ট কম নিয়ে পঞ্চম স্থানে ভারত। ছয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ২৫৪। সাতে থাকা আফগানদের পয়েন্ট ২৪১। ২২৬ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে ক্যারিবিয়ানরা। তাদের চেয়ে এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে আটে লঙ্কানরা। ২২০ পয়েন্ট নিয়ে দশে টাইগাররা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

না ফেরার দেশে সুবীর নন্দী

আফরোজা রুমা

- আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয় তুব কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
- পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই
- কেন ভালোবাসা হারিয়ে যায়
- দিন যায় কথা থাকে
- কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো।

কালজয়ী গানগুলোও এখন থেকে ইতিহাস হয়ে যাবে। অগণিত ভক্তকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন কিংবদন্তি গায়ক একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী সুবীর নন্দী। ৭ই মে বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৪টায় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ নানা সমস্যায় ভুগছিলেন সুবীর নন্দী। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

১৪ই এপ্রিল হার্ট অ্যাটাক করার পর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) লাইফ সাপোর্টে ছিলেন সুবীর নন্দী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ৩০শে এপ্রিল তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সংগীত শিল্পী সুবীর নন্দী ৪০ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র মিলিয়ে আড়াই হাজারের বেশি গান গেয়েছেন। এবং ২০১০ সালে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত জনতা ব্যাংকেই কর্মরত ছিলেন। তিনি শুধু সংগীত শিল্পী নন, অসংখ্য গানের গীতিকার ও সুরকারও ছিলেন।

১৯৫৩ সালের ১৯শে নভেম্বর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার নন্দীপাড়ায় সুবীর নন্দীর জন্ম। বাবার চাকরি সূত্রে তাঁর শৈশব কেটেছে চা বাগানে। তিনি গানের পাশাপাশি চাকরি করতেন জনতা ব্যাংকে। প্রাইমারিতে পড়ার সময় মা পুতুল রানীর কাছে সংগীতে হাতেখড়ির পর ওস্তাদ বাবর আলী খানের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতে তালিম নেন সুবীর নন্দী। সিলেট বেতারে তিনি প্রথম গান করেন ১৯৬৭ সালে। এরপর ঢাকা রেডিওতে সুযোগ পান ১৯৭০ সালে। রেডিওতে তাঁর প্রথম গান যদি কেউ ধূপ জ্বেলে যায়। বেতার থেকে টেলিভিশন, তারপর চলচ্চিত্রে অসংখ্য জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। ১৯৭৬ সালে আবদুস সামাদ পরিচালিত *সূর্যগ্রহণ* চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্লেব্যাকে আসেন সুবীর নন্দী। ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায় আজিজুর রহমানের ছবি *অশিক্ষিত*। সেই সিনেমায় সাবিনা ইয়াসমিন আর সুবীর নন্দীর কণ্ঠে– ও মাস্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই, গানটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। এরপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে আড়াই হাজারের বেশি গানে কণ্ঠ দেওয়া সুবীর নন্দী চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও চারবার বাসসাচ পুরস্কার পেয়েছেন। সংগীতে অবদানের জন্য পেয়েছেন একুশে পদক। ১৯৮১ সালে তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম বাজারে আসে। তাঁর অ্যালবামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রেম বলে কিছু নেই, ভালোবাসা কখনো মরে না, সুরের ভুবনে, গানের সুরে আমায় পাবে– ছাড়াও 'প্রণামাঞ্জান' নামে একটি ভক্তিমূলক গানের অ্যালবামও রয়েছে তাঁর। তাঁর মোট ২৮টি একক অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে।

সুবীর নন্দীর সেরা দশ গান

যদি কেউ ধূপ জ্বেলে যায়: ১৯৭০ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত হয় সুবীর নন্দীর গাওয়া এ গানটি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এটিই ছিল সুবীর নন্দীর প্রথম প্রচারিত গান।

দিন যায় কথা থাকে: ১৯৭৬ সালে *সূর্যগ্রহণ* সিনেমায় কণ্ঠ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্লেব্যাক করার সুযোগ লাভ করেন সুবীর নন্দী। তবে ১৯৭৯ সালে মুক্তি পাওয়া দিন যায় কথা থাকে সিনেমার শিরোনাম গানটি সুবীর নন্দীকে এনে দেয় তুমুল জনপ্রিয়তা।

ও মাস্টার সাব: ১৯৭৮ সালে কালজয়ী বাংলা সিনেমা *অশিক্ষিত*'র বিখ্যাত– ও মাস্টার সাব আমি নাম দস্তখত শিখতে চাই, গানটি ছিল তাঁর কণ্ঠের অন্যতম জনপ্রিয় গান।

পাখিরে তুই দূরে থাকলে: সুবীর নন্দী এই তুমুল জনপ্রিয় গান গেয়েছেন *লাল গোলাপ* সিনেমায়।

কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো: ১৯৮৬ সালে *উছিলা* সিনেমায় গান গেয়ে সুবীর নন্দীর জনপ্রিয়তাকে পৌঁছে দেয় আকাশ ছোঁয়া জায়গায়।

আমার এ দুটি চোখ পাথর তো নয়: ১৯৮৪ সালে আলমগীর কবিরের *মহানায়ক* সিনেমার গানটি বেশ সাড়া ফেলে তখনকার দর্শক শ্রোতাদের মাঝে। শুধু তাই নয়, এই গানটিই তাঁকে এনে দেয় প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই: এই গানটিও বেশ জনপ্রিয়তা পায় দর্শক শ্রোতাদের কাছে।

তুমি এমনই জাল পেতেছো সংসারে: *শুভদা* সিনেমায় গাওয়া এই গানটিও সুবীর নন্দীকে এনে দেয় দ্বিতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

একটা ছিল সোনার কন্যা: নন্দিত কথাসাহিত্যিক প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত *শ্রাবণ মেঘের দিন* সিনেমার গানটি সুবীর নন্দীকে শুধু তৃতীয় জাতীয় পুরস্কারই এনে দেয়নি বরং তাকে বাংলা সংগীতাঙ্গনে অমরত্বের স্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

ও আমার উড়াল পঙ্খীরে: *শ্রাবণ মেঘের দিন* সিনেমার এ গানটিও সমানতালে জনপ্রিয়তা পায়, ছড়িয়ে পড়ে লোকমুখে। নিজ কণ্ঠে গাওয়া এই গানের মতোই যেন উড়াল দিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

লেখক: প্রাবন্ধিক